রাধারাণী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু—"

"*Trust not a woman even when she's dead.*"

—***Buckley.***

কলিকাতা

১৮৯৬

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

ভূমিকা

আমি কখনও পুস্তক লিখি নাই,—লিখিয়া দেশে নাম জাহির করিবার ইচ্ছাও কখন করি না! তবে দেশকাল-পাত্র দেখিয়া, মনে কি এক নব ভাবের সঞ্চার হয় বলিয়া, কখনও কখনও ভবের গতি দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! কিন্তু ভবের গতিতে ভাবের খেলা বুঝিতে গেলেই, চক্ষের নিকট কতকগুলি চিত্র পরিস্ফুট হয়। একালের উচ্চশিক্ষার অড্ডাস্থল—কলেজের—আড্ডাগুলজার যুবকদিগের অবস্থার শোচনীয় পরিণাম, সেই চিত্রমধ্যে ফুটিয়া বাহির হওয়ায়, তাহা দেখিয়া আমার মন একেবারে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল,—শিহরিয়া উঠিলাম; ভাবিলাম, জগতের গতিই যেন ঐ একাভিমুখে! এই চিত্রদর্শন পর্য্যন্তই অন্তরে কি যেন এক ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত অনুক্ষণই হইতে লাগিল—তাহা যেন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না।

নিরুদ্ধ আবেগের বিকাশ অভিন্নহৃদয় বন্ধুর নিকট; হৃদয়-রুদ্ধ আবেগের ক্রমবিকাশে পরিচয় পাইয়া বন্ধুগণ তাহা আমায় লিপিবদ্ধ করিতে বলিলেন; তাঁহাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধে অনুরুদ্ধ ও সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহাদেরই অভিপ্রায়ানুসারে এই কার্য্যে ব্রতী। এক্ষণে এই সংসার-মরুর একটী জীবও ইহার সাহায্যে প্রলোভন-মরীচিকায় উপেক্ষা করিয়া সৎপথ অবলম্বনে সমর্থ হইলে সফলশ্রম হইব। ইতি

কলিকাতা,
১লা জানুয়ারী ১৮৯৬। } গ্রন্থকারস্য।

রাধারাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল, বড় দুর্দ্দিন, সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতেছে, আকাশ মেঘে ঢাকা—এক একবার সূর্য্য উদয় হইতেছে। একটী চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী ত্রিতল কক্ষে বসিয়া জনৈক যুবাকে একখানি পত্র লিখিতেছিল। স্ত্রীলোকটী সভ্য সমাজে ঘৃণিতা বারবনিতা বটে, কিন্তু উহার চরিত্রে কিছু বিশেষত্ব—রংদার নূতনত্ব ছিল। গৃহটী বেশ ফিটফাট, সাজান নয়; বেশ্যারা

যেরূপ গৃহ সাজান লইয়া ব্যস্ত থাকে, সে বিষয়ে তাহার স্পৃহা ছিল না। যুবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুটী শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে কিন্তু চক্ষের কোল একটু বসা, অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর, কুচযুগ ও নিতম্বের কথা অবশ্য বর্ণনাতীত। রমণীর নাম রাধারাণী, কিন্তু উহার মাতা আদর করিয়া "রাণী" বলিয়া ডাকিত।

রাধারাণী পত্র লিখিবে বলিয়া কাগজ, কলম ও দোয়াত সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, পত্রে কি বলিয়া সম্বোধন করিব। একবার ভাবিল "প্রাণেশ্বর" বলিয়া লিখি, আবার ভাবিল—না; অনেক চিন্তার পর "প্রাণের" বলিয়া পত্র লেখাই সাব্যস্ত করিল। লেখা সমাপ্ত করিয়া একখানি খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিল। ভাবিল, ডাকে পাঠাইব কি লোক দিয়া পাঠাইব; কি জানি, যদি অন্য কোন লোকের হাতে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে সমুদয় আশা ভরসা বিফল হইবে; এই সিদ্ধান্ত করিয়া নিজের বেহারা মাধবকে ডাকিল। হঠাৎ কিন্তু উহার 'বাবু' আসিয়া উপস্থিত। বাবুর নাম নিশিকান্ত, বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর, শীর্ণকায়, শ্যামবর্ণ, খোদার ক্ষুরের মত একটু দাড়ী আছে, মস্তকের মধ্যদেশে কেশ আদৌ নাই। রাধারাণী বাবুকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পত্রখানি গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিল। নিশিকান্ত পত্রখানি দেখিতে পায় নাই, কিন্তু লিখিবার উপকরণাদি দেখিয়া সন্দেহ করিয়া রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল "আবার কাহাকে প্রেম-পত্র লিখিতেছিলে?

বেহারাকে ডাকিতেছিলে কেন? আবার কোন যুবার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইলে নাকি? মনে ক'রে দেখো দেখি, এক বার বাগবাজারের কোন যুবার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলে, একবার গড়পারের কোন যুবার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া একুশ দিন বাটী পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আবার কেন ঐ রকম পাগলামি করিতেছ?" রাধারাণী বলিল "তুমি কি পাগল, আমি আবার কেন অন্য পুরুষকে পত্র লিখিব; আমি কি এতই লজ্জাহীনা? আমি একটী গান খাতায় তুলিতে ছিলাম। তোমরা ত বেশ্যাকে কখন বিশ্বাস কর না, কাজেই ঐরূপ কথা বলিবে বৈকি। তবে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দি, আমি আর পূর্ব্বের রাধারাণী নহি।"

নিশিকান্ত রাধারাণীকে বলিল, "আমি তোমার পূর্ব্বভাব ভাল জানিয়া এতদিন ত কিছুই বলি নাই, এক্ষণে লোক পরম্পরায় শুনিয়া মনে সন্দেহ হওয়ায় তোমাকে ঐরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা কর। আচ্ছা রাণী! তুমি কি নির্দ্দয়, তোমার প্রাণ কি পাষাণ, এত করিয়া ক্ষমা চাহিতেছি, অনুনয় বিনয় করিতেছি, তবু তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ? তুমি সত্য করিয়া বল, কি লিখিতেছিলে? আমার মনে আবার ভয় হইতেছে যে, আবার কোন যুবার প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে আমাকে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে। রাণী! তুমি নিশ্চয়ই কোন গোপনীয় পত্র লিখিয়াছ; নহিলে আমার মন চঞ্চল হইতেছে কেন? মনের অজানিত কিছুইত

নাই।" রাধারাণী উত্তর করিল, "তুমি আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ বিশ্বাস করিতে এখনও সেইরূপ কর। আমি আবার কেন পাগলামী করিব, যাহা হইবার হইয়াগিয়াছে, "গতস্ত শোচনা নাস্তি।" আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি কাহাকেও পত্র লিখি নাই। আমি তোমার নিকট কখনত কিছুই গোপন রাখি না, এক্ষণে কেন গোপন করিব; তুমি আমার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিতেছ।" রাধারাণী এই বলিয়া মনস্তুষ্টির জন্য নিশিকান্তকে নানারূপ 'আদর সোহাগ করিতে লাগিল, ক্ষণপরে ঔষধ ধরিয়াছে বুঝিয়া বলিল "আজ আর বাসায় যাইয়া কাজ নাই। তুমি ত এমন সময় কখনও এখানে আস না, ভাগ্যফলে আজ আসিয়াছ, আজ আর ছাড়িব না। একি! তোমার মুখ এত মলিন কেন? কিছু কি বিপদ হয়েছে? আমাকে সত্য করিয়া বল, নচেৎ আমি আত্ম-ঘাতিনী হইব। তুমি ত এখন আর আমাকে সন্দেহ কর না। তুমি কাহার নিকট কি শুনিয়াছ? আমায় যথার্থ করিয়া বল। মা এই কতক্ষণ তোমার কথা বলিতেছিল যে, অনেক দিন উঁহাকে ভাল করিয়া খাওয়ান হয় নাই, তা আজ উঁহাকে ভাল করিয়া মাংস তৈয়ার করিয়া খাওয়াস্।" নিশিকান্তের মন নরম করিবার জন্য রাধারাণী আবার বলিল, "যখন আসিয়াছ আর বাসায় যাইবার প্রয়োজন নাই, আমি তবে মাংস আনিতে দিই, তুমি মুখ হাত ধোও, আমি স্বয়ং রাঁধিব। তুমি আমার কাছে বসিয়া থাকিবে, দুইজনে একত্রে আমোদে রাঁধিব।"

নিশিকান্ত চীৎকার করিয়া বলিল, "রেখে দে তোর "আলুণে পিরীত"—খাব? আগে তোর পিণ্ডি চট্‌কাব। আমি আজ তোর ঘর ভেঙ্গে চিঠি বার ক'র্‌বই ক'র্‌বো। ভাল চাস্‌তো এখনো সত্য বল্, কিছু ব'ল্‌ব না।"

রাধারাণী কোন উত্তর না করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, নিশিকান্ত সজোরে হাত টানিয়া ধরিল। রাধারাণী রাগিয়া বলিল "আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি এত করিয়া বলিলাম, তাহাতে কি বিশ্বাস হইল না? যাও, তুমি চলিয়া যাও।" নিশিকান্ত এ দুর্জ্জয় অনুরোধ রক্ষা করিল না, অভিমানে গৃহত্যাগও করিল না, "চিঠি কোথায় রাখিলি বার কর," বলিয়া ক্রমাগত জিদ্ করিতে লাগিল। রাধারাণী হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; ছাড়াইতে না পারায় তাহার ক্রোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অবশেষে নিশিকান্তকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। এমন সময় রাধারাণীর কাপড়ের ভিতর হইতে সেই গুপ্ত লিপি খানি বাহির হইয়া পড়িল, নিশিকান্ত দেখিতে পাইয়াও পাইল না। রাধারাণী চকিতে কুড়াইয়া লইয়া নিজের মুখের ভিতর লুকাইয়া রাখিল। এদিকে রাধারাণীর মাতা গোলমাল শুনিয়া উপরে আসিল। রাধারাণীর মাতা নিশিকান্তকে বলিল "বাবা, নিশি কি হয়েছে? অমন ক'রছ কেন?" নিশিকান্ত তখন রাধারাণীকে ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। রাধারাণীর মাতা রাধারাণীকে বলিল "তুই বেটী কি ক'চ্ছিস্? এত মারামারি কেন? আমার নিশিত তেমন ছেলে নয়।

আর বাবা নিশি! ও এর মধ্যে কি এমন ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে, যে তুমি এত রাগ ক'চ্ছ? রাণী ত এই নীচে থেকে স্নান করিয়া উপরে এসে নিজের ঘরে বসে খাতায় গান লিখ্‌ছিল। আমিও তখনি নাচে হইতে উপরে আসিয়া ভাত রাঁধিতেছিলাম, কৈ কেউ ত চিঠি লইয়া এখানে আসে নাই এবং রাণী ত কাহাকেও পত্র লিখিয়া পাঠায় নাই। তুমি কেন মিছেঁ অত রাগ ক'চ্ছ বাবা! আমি কি তোমার নিকট মিথ্যা কথা কচ্ছি। আমায় ত' তুমি বেশ জান যে, কখন মিথ্যা কথা বলি না।"

নিশিকান্ত তখন রাগে গন্‌গন্ করিতে লাগিল; রাধারাণীর মাতাকে বলিল "মা আপনি জানেন না। চিঠি নিয়ে আসবে কেন, ও কাকে চিঠি লিখ্‌ছিল। ওর স্বভাব আবার খারাপ হয়েছে; না ম'লে আর শোধ্‌রাবে না— "স্বভাব যায় না ম'লে, কয়লা যায় না ধুলে।" ওর মেজাজ এখন অন্য রকম হয়েছে। আপনি উহাকে বুঝাইয়া বলুন যে, চিঠিখানি যেন আমাকে দেয়, আমি আর কিছুই চাই না। আজ চিঠি না পেলে রক্তগঙ্গা ক'রে যাব। আমি চিঠিখানি পেলেই উহাকে ছেড়ে দিব। মা! আমার বোধ হয়, রাণী আপনার গর্ভের মেয়ে নয়।"

রাধারাণীর মাতা রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিল "লক্ষ্মী মা আমার, যদি চিঠি লিখিয়া থাকিস্ তবে বাহির করেই দে না, এত কেলেঙ্কারি কচ্ছিস্ কেন? চিঠি পেলেই যদি সব মিটে যায় তবে তাই কর না? আমি আর পারিনে

বাপু, ইচ্ছে হয় গলায় দড়ী দিয়ে মরি। তোদের নিত্যি নিত্যি এ রকম ঝগড়া হ'লে কি সুখে দিন যাবে?" নিশিকান্ত রাধারাণীকে বলিল "চিঠি দিবিতো দে, তা' না হ'লে তোকে গুলের ছ্যাঁকা দেবো।" রাধারাণী বলিল, "চিঠি কোথায় তা' দোবো? ভাল চাও ত ছেড়ে দাও, নইলে বাড়ী ঢোকা এই শেষ।" এই কথা নিশিকান্তের বজ্র সমান লাগিল; প্রকাশ্যে বলিল "শেষ তা আমি জানি, এই দেখ্ শেষ ক'রে যাই।" এই বলিয়া চাকর যে তামাক দিয়া গিয়াছিল সেই গুল লইয়া উহার গালে ফেলিয়া দিল। রাধারাণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমায় মেরে ফেল্লেরে, আমায় মেরে ফেল্লে। এমন লোকের হাতেও প'ড়েছিলাম যে আমায় প্রাণে মারবার যোগাড় ক'চ্ছে। একবার তোমরা সকলে এসে দেখে যাওগো!" বাটীর আর আর সকলে আসিয়া ছাড়াইয়া দিতে উপস্থিত হইল এবং নিশিকান্তকে উহার মাতা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল ও বলিল, "তোমার না পোষায় তুমি আর না আসিতে পার, এমন ক'রে গুলের ছ্যাঁকা দেবার তোমার কোন ক্ষমতা নাই, আমি মনে ক'র্লে তোমাকে পুলিসে দিতে পারি জান। আমার মেয়েকে তুমি এখনি মেরে ফেলেছিলে ত?" নিশিকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাধারাণী বলিল "আমার বাড়ী হইতে তুমি এখনি দূর হও, আমি তোমার নিকট থাকিতে চাহি না। আমি তোমাকে কটু দিব্য দিতেছি যে আর তুমি আমার বাটী আসিও

না, আমি নিজে পুলিসে গিয়া নালিশ করিব। তুমি ভাল চাও ত আমার বাড়ী হতে এখনি দূর হও।" নিশিকান্ত রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাসায় চলিয়া গেল এবং রাধারাণীকে বলিয়া গেল যে "ইহার পর কে তোকে রক্ষা করে দেখিয়া লইব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
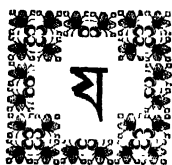
যতীন নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, এমন সময় উহার প্রাণের বন্ধু চুণি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীন জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম প্রায় ২৭।২৮ বৎসর, গঠন বলিষ্ঠ, চক্ষু দুটী পটোল-চেরা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শান্তপ্রকৃতি, কখনও কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করে না; এখনও কলেজে পড়ে। চুণি আসিলে সে বলিল "এস ভাই, দুজনে একবাজী দাবাবোড়ে খেলি, মনটা বড় খারাপ আছে; কারণ এইবার বি, এ, একজামিন দিতে হবে, যদি পাশ না হ'তে পারি, তা' হ'লে জন-সমাজে মুখ দেখাতে পার্‌ব না।" চুণি বলিল, "ভাল ক'রে মন দিয়া প'ড়্‌লে তুমি নিশ্চয়ই পাশ হবে, এস এখন একবাজী খেলা যাক্।' চুণি যতীনের একজন প্রাণের বন্ধু, দেখিতে বেশ,

যুবা পুরুষ, চুলগুলি কোঁকড়ান, চক্ষু দুটী ঢলঢলে, নাসিকাটী বাঁশীর মত, বয়স প্রায় ২৫।২৬। দুজনে দাবাবোড়ে খেলিতেছে, এমন সময় যতীনের চাকর নফর একখানি চিঠি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং যতীনকে চিঠিখানি দিয়া চলিয়া গেল। নফর যতীনের বাটীতে প্রায় ৩০ বৎসর কাজ করিতেছে; সে অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং জাতিতে কায়স্থ।

যতীন খেলা বন্ধ করিয়া চিঠিখানি পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইল। চিঠি পড়িয়া চুণিকে বলিল "ভাই চুণি! এক খানি প্রেম-লিপি দেখ, কেমন মজার চিঠি; আমিত ইহাকে যখন আমাদের বাটীর নিকট থাকিত, তখন ছেলে মানুষ দেখিয়াছি; রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়াইত, প্রায়ই আমাদিগের বাটীর নিকট আসিত, রাস্তায় জলের গাড়ী গেলে উহাতে পা দিয়া খেলা করিত—উহার সহিত আমার জানা শুনা এই পর্য্যন্ত। এখন আমাকে কেমন এক খানি প্রেমপত্র লিখেছে একবার দেখ, তুমি কি বল? ইহাতে কি করিব? ইহার উত্তর দিব কি না বল? বেশ্যাবাড়ী কি প্রকারে যাইব? আমি ত কখন কোন বেশ্যাবাড়ী যাই নাই; তবে অতি অল্প দিন হইল উহা-দিগের বাটীতে প্যারী স্বর্ণকার থাকিত তাহার নিকট আমার কিছু গহনা গড়িতে দিয়াছিলাম, ঐ লোক জিনিস লইয়া আর আমাকে দিতে চাহে না, অনর্থক টানাপোড়েন করাইতেছে। সেইজন্য আমি নিজে উহাকে ধরিবার জন্য

ঐ বাড়ীতে গিয়াছিলাম মাত্র। দেখিলাম, একটী বেশ সুন্দরী যুবতী, বয়স প্রায় ২৩।২৪ এই মাত্র জানা শুনা। চিঠি পাইয়া মনে হইল যে, সেই যুবতীই রাধারাণী। বাল্য-কালে যে রাধারাণীকে খেলিতে দেখিতাম, এ নিশ্চয়ই সেই রাধারাণী। নহিলে আমার নাম ও বাড়ী কি প্রকারে জানিবে? চুণি বলিল, "চিঠিখানি একবার প'ড়ে শোনাওনা" যতীন চিঠিখানি পড়িল—

২১এ আষাঢ়, বুধবার।

প্রাণের!

আপনাকে পূর্ব্বে আমাদিগের বাড়ীর নিকট চোখের দেখা দেখিতাম মাত্র। এক্ষণে একদিবস প্যারী স্বর্ণকারের নিকট গহনার তাগাদা করিতে আসিয়াছিলেন, সেইদিন আপনাকে দেখিয়া অবধি আমার মন প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে আর কি জানাইব। যদি কখন ভগবান আমাদিগের উভয়কে একত্র করেন, তাহা হইলে এ জীবন সার্থক জানিব। একদিন সন্ধ্যার সময় থিয়েটার দেখিবার নাম করিয়া আমার সহিত যদি দেখা করেন, তাহা হইলে আশাতীত আনন্দ লাভ করিব। পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় তৃষিত চাতকীর ন্যায় রহিলাম। আজ এই পর্য্যন্ত।

আপনারই

হতভাগিনী

রাণী।

চুণি পত্রপাঠ করিয়া বলিল "বেশ্‌ত ইহাতে ক্ষতি কি? বেশ্যাবাড়ী যাইলেই যে লোকে খারাপ হইয়া যায়, তাহা নহে। বেশ্যাবাড়ী যাইলে বরং অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে শুধু চালাক চতুর করিবার জন্য অভিভাবকগণ পুত্রাদিকে বেশ্যাবাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। **There are many things to learn** (দেয়ার আর্‌ মেনি থিঙ্গস্‌ টু লার্‌ণ্‌) শিক্ষার অনেক আছে।" যতীন বলিল, "তুমিত ব'ল্লে, আমাকে লোকে কি বল্‌বে, প্রথমে মজা দেখ্‌তে গিয়ে শেষে কি মজ্‌তে হবে। তুমি ব'ল্‌ছ এত ক'রে পত্র খানি লিখেছে একবার যাওয়ায় ক্ষতি কি? একান্তই যদি নাছোড়বান্দা হও, কি ক'র্‌ব, লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে আচ্ছা আমি উপরোধে একদিন যাবো স্বীকার কর্‌ছি"। চুণি বলিল "ভাই যতীন আজই চলনা। যাইতে যাইতে পথে একবার দেখা ক'রে যাব; আজ ত শনিবার, চল, ষ্টার থিয়েটারে যাই।" যতীন বলিল "আচ্ছা চল আপত্তি নাই, তবে একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'বে, দাদামহাশয় বাড়ী এলে তাঁহাকে একবার ব'লে যাব। আর তুমি ভাই বাড়ী গিয়ে শীঘ্র আহারাদি ক'রে এস, দে'খ যেন বিলম্ব হয় না।"

যতীন এই বলিয়া চুণিকে বিদায় দিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। নফর চাকর আসিয়া উপস্থিত। যতীন উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, সে কোথায়?" নফর উত্তর করিল "সে অনেকক্ষণ এখান হ'তে চ'লে গিয়েছে।" যতীন তখন মনে মনে

ভাবিতে লাগিল—এখন কি করি, প্রথমতঃ প্রাণের বন্ধুর অনুরোধ, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের অনুরোধ। আমার মনও অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। কেন হইতেছে—জানিনা। আমি কোথায় বি এ পাশ করিয়া এম এ দিব, না এ আবার কি বিভ্রাট। যাহা হউক একদিন দেখে আস্‌তে ক্ষতি কি? যখন স্ত্রীলোকটী নিজে উপযাচক হইয়া চিঠি পাঠাইয়াছে, তখন একবার দেখে আসাই ভাল। দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে।"

দিন আর কাটে না, কত ক্ষণে সন্ধ্যা হয়, দাদা মহাশয় কখন আসিবেন? ভাবনায় অস্থির হইয়া যতীন বাইরণ (Byron) খানি খুলিল, কিন্তু পড়িতে মন সরিল না, কেবল ঐ চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কৈশোরে পরিণয়, যৌবনে সাধের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু—এই সকল জ্বলন্ত চিত্র যতীনের হৃদয়ের মধ্য দিয়া এক একখানি করিয়া চলিতে লাগিল। তখন বেশ্যার প্রতি ঘৃণা আসিল। যতীন একবার ভাবিল, "অযাচিত প্রেম।" তাহার পর ভাবিল, বেশ্যা—বেশ্যা কি ভালবাসিতে জানে না? বেশ্যার হৃদয়ে কি ভালবাসা নাই? এইত কত লোকে বেশ্যার জন্য চুরি, বাটপাড়ী, জাল, খুন ও আত্মহত্যা করিতেছে; কত্ত নিজের সহধর্ম্মিণীর জন্য কেহ কি এইরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য্যে কখন অগ্রসর হয়? স্ত্রীর ভালবাসা অটল, নিষ্কাম, ও পবিত্র; কিন্তু বেশ্যার হৃদয় কিরূপ জানি না, যতদূর শিক্ষাচালিত দেখিতে পাইতেছি,—সে হৃদয়ে ভালবাসা

নাই, প্রকৃতপক্ষে আছে কি না, কে জানে? তবে মরুভূমিতেও যেমন ওয়েসিস্, বোধ হয় অনেক কষ্টে বেশ্যার হৃদয়েও সেইরূপ পবিত্র ভালবাসা পাওয়া যায়।" এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় লাগিল। তখন যতীন ভাবিল "দাদা মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহাকে এ সব এখন কিছুই বলিব না, অগ্রে কাপড় ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হউন।"

যতীনের পিতামহ, কলিকাতার একজন সম্পত্তিশালী বর্দ্ধিষ্ণু লোক, সকলে মান্য করিয়া থাকে, পরোপকারী, বাড়ীতে অন্নের দানছত্র অর্থাৎ কেহ যাইলে না খাইয়া ফিরিয়া আসিত না। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০।৭০ বৎসর, দেখিতে গৌরবর্ণ, মস্তকের চুলগুলিতে এখনও পক্কতা ধরে নাই, দেখিলে বোধ হয় যেন "পাকা আমটী।" তিনি সওদাগরী আপিসে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার আপিসের বেশ এইরূপ ছিল—মস্তকে একটী শ্বেতবর্ণের পাগড়ী, পরিধানে থানধুতি, গায়ে সাদা চাপকান, বুকের উপর সোনার চেন ঝুলিতেছে, পায়ে ফুলমোজা ও পেনেলার জুতা। তিনি যতীনের বৈঠকখানার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতে যতীনের ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "ভাই যতীন, এক্জামিনের আর কত দেরী আছে?" যতীন বলিল "এখনও বিলম্ব আছে।" "তুমি শীঘ্র করিয়া একটু বাদে উপরে আইস, আমার কিছু বিষয় কার্য্য আছে।" এই বলিয়া যতীনের পিতামহ অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

অল্প বয়সে যতীনের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহ যতীনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন। যতীনের পিতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, ফিট্ গৌরবর্ণ, বলিষ্ট যুবা, তিনি অতিশয় সৌখীন ছিলেন, তাঁহার বাগানের উপর অত্যন্ত সখ ছিল, যতীনের মাতার পরলোক গমন হইলে উহার পিতা সকল কাজ কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বাগানেই থাকিতেন।

যতীন বৃদ্ধের একমাত্র অন্ধের যষ্টী ছিল। ক্ষণমাত্র কাছ-ছাড়া করিতেন না, নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন, প্রাণের মতন ভালবাসিতেন, যখন যাহা আবশ্যক হইত তখনি দিতেন, কখন দ্বিরুক্তি করেন নাই। যখন যতীনের কোন কার্য্য না থাকিলে তখন বৃদ্ধ, যতীনকে আপিসের কাজ কর্ম্ম নিজে ডাকিয়া শিখাইতেন। দাদা মহাশয় যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যতীন একবার সন্ধ্যার পর আমার সহিত দেখা করিও।" যতীন ভাবিল, "যদি আমাকে আপিসের কার্য্য করিতে দেন, তাহা হইলে আমার থিয়েটার দেখা বন্ধ হইবে, একে তাঁহার থিয়েটারের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ আছে।"

যতীনের যখন স্ত্রী জীবিতা ছিল তখন কালে ভদ্রে—শ্বশুরবাটী হইতে থিয়েটারে যাইত। এক্ষণে স্ত্রী নাই—বিষম সমস্যা—কি বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইবে, ভাবিল, অদ্য মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাক্‌বেথের অভিনয় হইবে, বোধ হয় তাহাতে দাদা মহাশয়ের কোন আপত্তি হইবে না। এমন

সময় বাটীর ভিতর হইতে "যতীন যতীন" বলিয়া দাদা মহাশয় ডাকিলেন। যতীন চলিয়া গেল। যতীন বাটীর ভিতর চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে উহার প্রাণের বন্ধু চুণিবাবু বেশভূষা করিয়া আসিয়া গম্ভীর স্বরে "নফর নফর" করিয়া ডাকিল। নফরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর যতীন বাবু কোথায়?" নফর উত্তর করিল, "বাবু কর্ত্তা-মহাশয়ের নিকট বাটীর ভিতর গিয়াছেন, কি বিশেষ কার্য্য আছে। আপনাকে বসিতে বলিয়া গিয়াছেন।" চুণিবাবু নফরকে বলিল "ততক্ষণ চট্ ক'রে এক্‌ছিলিম খাস অম্বুরী তামাক সাজিয়া গড়গড়াতে দিয়ে যা।" নফরও শীঘ্র আসিয়া তামাক দিয়া চলিয়া গেল। চুণিবাবু তামাক খাইতে লাগিল, এমন সময় যতীন বাহিরে আসিয়া চুণিকে বলিল "অদ্য বেশ ফিকির করিয়াছি। দাদা মহাশয়কে বলিয়াছি যে, আজ ম্যাকবেথ অভিনয় দেখিতে যাইব।" দাদা মহাশয় নিমরাজি হইয়া বলিলেন—"তুমি যেতে ইচ্ছা কর যাও, কিন্তু থিয়েটার জায়গা অতি ভয়ানক। আমার ইচ্ছা নয়, তবে ম্যাক্‌বেথ বলিতেছ যাইতে পার।" চুণি যতীনকে বলিল "চট্‌পট্ করিয়া লও, চল আর দেরি করিও না। তোমার খাওয়া হয়েছে ত?" যতীন বলিল, "দাদা মহাশয়ের পাতে কিছু খাইয়া আসিয়াছি। পরে রাত্রে আসিয়া পুনরায় আহার করিব। যতীন খটাৎ করিয়া নিজের আলমারী খুলিল, উত্তম থানধুতী পরিল, ফেলস্ কোং দোকানের উত্তম সিল্কের কামিজ পরিল, চুল

ফিরাইল। যতীন প্রায় সিঁতা কাটিত। রুমালে স্মিথের বাড়ীর ল্যাভেণ্ডার দিল। কাণে আতর দিবার জন্য আতরের বাক্সের চাবি খুঁজিতে লাগিল। এমন সময় চুণি বলিল, "নেনে আর আতর কাণে দেয় না।" "তুমিও একটু মাখ" এই বলিয়া যতীন একটু (ক্রেব্ এপ্ল্ ব্লসম্) এসেন্স চুণির মাথায় ও গায়ে ছড়াইয়া দিল। যতীন সোহাগের আতর বড় ভালবাসিত। সোহাগের আতর কাণে দিয়া দুজনে টক্ টক্ করিয়া সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিল। যাইবার সময় নফরকে বলিয়া গেল "আমার খাবার বাহিরে রাখিয়া দিস্, আমি থিয়েটার হইতে আসিয়া খাইব।" দুজনে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যতীন ও চুণি উভয়ে একত্রে সদর রাস্তায় উপস্থিত হইল। দুজনে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে একমনে চলিতে লাগিল, খানিক দূর আসিয়া একটী মোড় ফিরিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল। চুণি দেখিল, একটী ত্রিতল বাটী, সম্মুখে বৃহৎ উদ্যান; উদ্যানটী বহু লোকাকীর্ণ, রাস্তায় কেহ হাওয়া খাইতে যাইতেছে, পরিশ্রান্ত কেরাণী বাবুরা উর্দ্ধশ্বাসে গৃহমুখে ছুটিতেছে, কোথাও চাকরেরা ছেলেপুলে লইয়া বেড়াইতেছে, বড় বড় জুড়ী গাড়ী রাস্তা কাঁপাইয়া যাইতেছে, কোথাও বেলফুল-ওয়ালা "চাই বেলফুল" বলিয়া হাঁকিতেছে, এমন সময় চুণি যতীনকে বলিল "ভাই যতীন কিছু বেলফুলের মালা কেনো না কেন, তোমার নব প্রণয়িণীকে উপহার

দিতে হ'বে ত।" যতীন বলিল "এখন ও সব কাজ নাই, ইহার পর দেওয়া যাবে।" এই বলিয়া দুজনে উদ্যানটীর ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। উদ্যান তখন ক্রমে গ্যাস-মালায় আলোকিত হইতে লাগিল। চন্দ্রমা নক্ষত্রদল সমেত পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল, জ্যোৎস্না-লোকে দূরের বস্তু বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। তখন উভয়ে দেখিতে পাইল, রাধারাণী একখানি বাদামী রঙ্গের সুইস্ কাপড় পরিয়া উনবিংশতি শতাব্দীর ফেসানে একটী কাল পেটিকোট্ গায়ে দিয়া উত্তমরূপে কেশ বিন্যাস করিয়া মাথায় গোলাপ, হাতে গোলাপ, যেন ফুলরাণী সাজিয়া আরো কয়েকটী সমবয়স্কার সহিত ত্রিতলে ছাদের উপর হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিল; এবং এক একবার তাহার বাটীর নিচের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল।

যতীন ও চূণি উভয়ে মাথায় কাপড় দিয়া চুপি চুপি বাটীতে প্রবেশ করা স্থির করিয়া বাগান হইতে একেবারে রাস্তা অতিক্রম করিয়া গোঁভরে বাটীতে প্রবেশ করিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়া উভয়ে ভাবিতে লাগিল কি প্রকারে উহার নিকট একেবারে দুজনে সাক্ষাৎ করিব। চূণি বলিল "ঐ বাটীর প্যারী স্বর্ণকারকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক;" এই সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে সিঁড়িতে উঠিয়া "প্যারী প্যারী" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। যতীনের স্বর রাধারাণীর কর্ণে পশিল। নিশা আগমনে কুমুদিনী যেরূপ পুলকিত হয়,

যতীনের গলার আওয়াজ পাইয়া সেইরূপ রাধারাণীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেবারে দৌড়াইয়া নিচে আসিয়া যতীনের নিকট উপস্থিত হইল। যতীন উহার মুখের দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল; মুখে একটীও কথা সরিল না। চুণি উহার মধ্যে একটু চালাক চতুর—সে বলিল "তোমাকেই খুঁজিতেছি।" পরে রাধারাণী যতীনের হাত ধরিয়া এবং চুণিকে লইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিল, যতদূর অভ্যর্থনা করিতে হয় করিল,—তাহার কিছুই ত্রুটী হইল না। উভয়ে কেহই কোন কথা কহিতে পারিতেছে না; উভয়েই নীরব, কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। চুণি জিজ্ঞাসা করিল "সুন্দরি! তুমি আমার বন্ধুকে কেন পত্র লিখিয়াছিলে? কেবল চুপ ক'রে বসিয়া থাকিবে কি? আমরা বেশী ক্ষণ বসিতে পারিব না, কারণ তুমি পরাধীনা।" চুণি যতীনকে বলিল "নাও ভাই, শীঘ্র শীঘ্র কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া লও, আবার থিয়েটারে যাইতে হইবে, তাহা না হইলে শেষে আবার কি একটা বিভ্রাট ঘটাইবে। আমাকে যদি লজ্জা হয়, তাহা হইলে আমি নিজেই চলিয়া যাই।" যতীন হাত ধরিয়া বলিল "ভাই চুণি! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে?" চুণি বলিল "আমার শরীরটা কেমন করিতেছে, আমি এই সামনের ছাদে একটু পায়চারি করি, তোমার কোন ভয় নাই আমি একেবারে চলিয়া যাইব না।" যতীন

ইহাতে কোন আপত্তি করিল না; চুণি ঘরের বাহিরে আসিল। রাধারাণী একদৃষ্টে যতীনের দিকে চাহিয়াছিল; অবসর পাইয়া হাত ধরিয়া বলিল, "দাসীর একটী অনুরোধ রাখিবেন কি? একটী পান খান, আমি আপনার মুখে তুলে দি।" যতীন পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, বেশ্যারা পানের সহিত অনেক ঔষধ দিয়া লোককে বশ করে; ভাবিল, কি জানি যদি কোনরূপ ইহাতে ঔষধ থাকে—এই ভাবিয়া এবং যুবতীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিল, "খেতে পারি যদি তুমি মুখের পান দিতে পার।" রাধারাণী মনে মনে ভাবিল, বেশ সুরসিক লোক, যতীনকে বলিল, "আমি বেশ্যা, আমার এমন কি সৌভাগ্য, যে আপনি আমার মুখের পান খাইবেন।" এই বলিয়া একটী পান চিবাইয়া সাদরে যতীনের গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত, মস্তিষ্ক বিচলিত, প্রাণ উদাস হইয়া গেল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাধারাণীর ওষ্ঠ কম্পিত ও সমস্ত দেহ বিচলিত হইতে লাগিল। উভয়ের হৃদয়ে যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে লাগিল। রাধারাণী আত্মহারা। যতীন ও রাধারাণী উভয়ে পরস্পরকে বক্ষে ধারণ করিল। এইরূপে দুইজনে আত্মবিস্মৃত যেন কুহক-জালে জড়িত, কাহারও কিছুই জ্ঞান নাই। এইরূপ কত কাল অতীত হইলে, চুণি ঘরে আসিল, তখন উভয়ের চমক ভাঙ্গিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চুণি বলিল "আর দেরি করিতে পারি না, শীঘ্র চল

থিয়েটার দেখিতে যাই।” যতীন বিস্মিত, অভিভূত, যেন পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। চুণি হাত ধরিয়া জোর করিয়া তুলিল। এ দৃশ্যে রাধারাণীর প্রাণে শেল বিঁধিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, আমি পরের; পরের কি? আমার দেহ যেন উহার নিকট বিক্রীত, কিন্তু আমার প্রাণ ত বিক্রয় করি নাই। বেশ্যাজীবন কি বিড়ম্বনা! প্রাণ ভরিয়া কাহাকেও ভাল বাসিবার যো নাই, আর আমি বেশ্যাবৃত্তি করিব না, আমি ইঁহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, ইঁহারই দাসী হইয়া জীবন কাটাইব। আমি কোন স্বার্থের জন্য ইহাকে প্রাণ দিব না, নিঃস্বার্থে প্রাণ দিব, দেখি যতীন যদি প্রাণ দেয় তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ আমি উহার সহধর্ম্মিণীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া পদসেবা করিব।” যতীন ভাবিল, রাধারাণী কি আমার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় হইবে? বেশ্যার প্রাণে কি এত ভালবাসা স্থান পায়? যতীন বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু বাক্য সরিল না; অনেক কষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল “তবে আসি”। রাধারাণী বাষ্পাকুল-লোচনে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই এক ফোঁটা অশ্রু গণ্ডস্থল বাহিয়া বক্ষে পড়িল, অতি কষ্টে বলিল “আসুন, তবে প্রার্থনা—দাসী বলিয়া একটু মনে রাখিবেন।” চুণি যতীনকে সজোরে টানিয়া লইয়া নিচে নামিল; বেহারা আসিয়া আলো ধরিল। চুণি ও যতীন বাটী হইতে থিয়েটারে গমন করিল। প্রবাসে গমনোদ্যত স্বামীকে বিদায় দিয়া স্ত্রীর প্রাণে যেরূপ কষ্ট হয়,

সেইরূপ রাধারাণী যতীনকে বিদায় দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে যতদূর তাহার দৃষ্টি চলিতে লাগিল ততদূর পর্য্যন্ত যতীনকে দেখিতে লাগিল। রাধারাণী বিছানায় আসিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল; মনে করিল, এ আবার কি করিলাম, যতীন কি আমার হ'বে না? আশা আসিয়া সান্ত্বনা বাক্যে তাহার কর্ণে বলিল,

"যতীন তোমারি," "যতীন তোমারি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিডন ষ্ট্রীট, মিনার্ভা থিয়েটার, গ্যাসের আলোকে চারিদিক আলোকিত, সম্মুখে চারি পাঁচখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া, এপাশ ওপাশে পান ও তামাকুওয়ালা দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। রঙ্গালয়ের দ্বার তখনও পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই, সুতরাং দর্শকেরা এধার ওধার চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছেন, কেহবা সোডা লেমনেড্ খাইতেছেন, কেহবা বার্ডসাই টানিতেছেন, কেহবা গল্প করিতেছেন, কেহবা হাসিতেছেন। সকলেই নানারূপ বেশভূষা করিয়া আসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছোকরারা "বাবু তামাক খাবেন" "বাবু মনে রাখিবেন রামার তামাক"—এই বলিয়া হাঁকিতেছে। এমন সময় যতীন ও চুণি থিয়েটারের গাড়ী বারান্দার নিচে আসিয়া উপস্থিত; থিয়েটারের ঘড়িতে দেখিল

রাত্রি প্রায় ৮॥টা, পাশেই টিকিট ঘর। একটী বৃদ্ধ গৌর-বর্ণ, পক্ককেশ, শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত, খর্ব্বাকার বাবু বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিতেছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শীর্ণকায়, কাল কোটধারী যুবা বসিয়া তামাকু টানিতেছেন, যতীন ও চুনি দুজনে চারিটী টাকা দিয়া দুইখানি সম্মুখে বসিবার আসন (ষ্টলের টিকিট) কিনিল, দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রি ৯টা বাজিল, ঐক্যতান বাদন, পরে ৯॥টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইল। গিরিশ বাবু ম্যেকবেথ, শ্রীমতী তিনকড়ী দাসী লেডী ম্যেকবেথ এবং বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী পোর্টার, ডাকিনী, হত্যাকারী, ডাক্তার ও বৃদ্ধ লর্ড এবং আরও অনেক খ্যাতনামা অভিনেতৃগণ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেখিতে যাইয়া যতীনের প্রাণে কিছুই ভাল লাগিল না, ভাবিতে লাগিল, কত-ক্ষণে শেষ হয়। তাহার হৃদয়ে রাধারাণীর সমস্ত ঘটনা যেন আগ্নের অক্ষরে জ্বলিতে লাগিল। যতীন ধ্যানমুগ্ধ, সুতরাং পলে পলে রাধারাণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। এইরূপে প্রথম দুই অঙ্ক কাটিয়া গেল। তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইলে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখে যে, রাধারাণীর সেই বেহারা মাধব সম্মুখে উপস্থিত, হস্তে একখানি তোয়ালে ঢাকা থালা। যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "মাধব তুমি এখানে কেন?" মাধব উত্তর করিল, "দিদিবাবু একখানি

পত্র এবং এই খাবার পাঠাইয়াছেন, আমার সাম্নে খাইতে বলিয়া দিয়াছেন।” যতীন পত্রখানি উহার হস্ত হইতে লইয়া দেখিল, একখানি শ্বেতবর্ণ ফুলদার কার্ডে লিখিয়াছে যে “আমার দিব্য এই সামান্য বস্তু সমুদয় আমার চাকরের সাম্নে খাইবেন, তাহা না হইলে আমি মনে বড় ব্যথা পাইব, আর মাকে কিছুই বলিবেন না।” পত্র-পাঠ করিয়া যতীন ভাবিতে লাগিল, “কি করি, খাওয়া উচিত কি না।” চুণি কহিল, “ভগবান জুটাইয়াছেন উহা ফেরত দিতে নাই—“তৈযারী খানা মৎ ছোড়না”। তোমার থিয়েটারে আসিবার সময়ত ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই, চল ঐ ডাক্তারখানায় যাওয়া যাক্। আমার যথেষ্ট আলাপ আছে, ঐখানে বসিয়া খাওয়া যাবে।” এই বলিয়া মাধবকে পাছু পাছু আসিতে বলিয়া উভয়ে ডাক্তারখানার দিকে চলিল। ডাক্তারখানার ভিতরে যাইয়া বেহারাকে বলিল “দুই গেলাস জল দাও।” বেহারা জল আনিয়া দিল। দুইখানি চৌকীতে দুই বন্ধু বসিল, সম্মুখে একটী শ্বেত বর্ণের মার্ব্বেলের টেবিল এবং চতুর্দ্দিকে ঔষধের আলমারী রহিয়াছে। যতীন মাধবের নিকট হইতে সেই তোয়ালে ঢাকা থালাখানি লইয়া ঐ টেবিলের উপর রাখিল। ঐ থালা একখানি বড় টর্কিস তোয়ালে বাঁধা ছিল উহা খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, একখানি পদ্মকাটা মাঝারী থালে, শুভ্র বর্ণের গোলাকার চারি গোছা ফুল্কা-লুচি এবং দুটী বাটিতে মাংসের কোর্ম্মা, আলুবোখরার

চাট্‌নি এবং নানা রকম মিষ্টান্ন সাজান ছিল। লবণ ও লেবু পর্য্যন্ত দিয়াছিল, কিছুরই ত্রুটী হয় নাই। মোটের উপর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় একাধারে বর্ত্তমান। থালে খাবারগুলি থরে থরে এমন সুন্দররূপে সাজান, যে দেখিলেই বোধ হয়, যেন স্ত্রী সযত্নে স্বামীর নিকট পাঠাইয়াছে। থালখানিও এত সুন্দররূপে মার্জ্জিত যে স্বর্ণ থাল বলিয়া ভ্রম হয়। উভয়ে খাইতে বসিল, কিন্তু যতীনের মুখে প্রথমে কিছুই উঠিল না, কেবল রাধারাণী যত্ন করিয়া পাঠাইয়াছে বলিয়াই অবশেষে দু'একখানি মুখে দিল।

দেখিতে দেখিতে চুণি খাবারগুলি অর্দ্ধনিঃশেষিত করিয়া দুই গেলাস জল দুইজনে পান করিয়া গেলাসের ভিতর হাত ডুবাইল। পরে উভয়ে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ হাত মুছিল। মাধব একটী সুন্দর গঠনের 'ডিবা' যতীনের হাতে দিল। যতীন ডিবা খুলিয়া দেখিল ডিবাটী পানে পরিপূর্ণ, খুব চাপাচাপি করিয়া ধরাইয়াছে, আপনি দুইটা লইল এবং চুণিকে দুইটা দিল। যতীন ডিবা হইতে পানগুলি বাহির করিয়া আপনার জামার পকেটে রাখিয়া মাধবকে দুইটী টাকা দিয়া ডিবাটী ফেরত দিল। পানগুলি গোলাপ জলে ভিজান ও নানা রকম মশালা দিয়া প্রস্তুত। মাধব টাকা লইতে প্রথমতঃ কুণ্ঠিত হইল এবং বলিল, যে "দিদিবাবু টাকা লইতে একেবারে বারণ করিয়া দিয়াছে, সেজন্য আমি লইব না।" যতীন বলিল "তোর কিছু ভয় নাই

আমরা তোর দিদিবাবুকে টাকার বিষয় কিছুই বলিব না।” তখন তাহার সাহস হইল। হাত বাড়াইয়া টাকা দুইটী লইয়া আনন্দে যতীন ও চুণি বাবুকে লম্বা সেলাম করিয়া থালা ও তোয়ালে লইয়া চলিয়া গেল।

যতীন চুণিকে বলিল “আমার শরীর এবং মন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে আজ থিয়েটারে যাব না, চল এইখান হ'তে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে একেবারে বাড়ী যাই।” চুণিও উহাতে সম্মত হইল। সম্মুখে একখানি গাড়ী গড় গড় করিয়া যাইতেছিল গাড়োয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল “বড়বাজার যাইতে কত ভাড়া নিবি?” গাড়োয়ান বলিল “ছয় আনা।” যতীন উহাতে কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে দুই বন্ধুতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। গাড়ীতে রাধারাণীর বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল। গাড়ী চোরবাগানের মোড়ে উপস্থিত, গাড়োয়ান বলিল “বাবু” এবার কোনদিকে যাব? যতীন গাড়ী হইতে বলিল, “ডাইনা যাও।” দেখিতে দেখিতে যতীনের বাটীর নিকট গাড়ী থামিল। দরওয়ান দরজার চাবি খুলিয়া দিল। যতীন বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় চুণিকে বলিয়া দিল যে, “কাল প্রাতে যত শীঘ্র পার আসিয়া দেখা করিবে অনেক কথাবার্ত্তা হ'বে” চুণি নিজ গৃহে চলিয়া গেল। যতীনের সে রাত্রিতে নিদ্রা আসিল না, কেবল রাধারাণীর চিন্তাই মনে জাগিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যতীন ও রাধারাণীর প্রণয়ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। যতীন উহার বাটীতে মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। রাধারাণী আপনার স্বামীর ন্যায় তাহাকে যত্ন করিতে লাগিল। ঐরূপ যত্নে মুগ্ধ হইয়া যতীন আপনার পূর্ব্ব স্ত্রীর মৃত্যুশোক একেবারে ভুলিয়া গেল। রাধারাণী ক্রমে ভাবিতে লাগিল যে, "এ প্রণয়ে কি প্রকারে দুজনে দিবানিশি একত্রে শয়ন ও ভোজন হইবে।" এই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, "যে আমি এক্ষণে নিশিকান্তকে কি প্রকারে তাড়াই, আর আমার ক্ষণেকের নিমিত্ত উহাকে ভাল লাগে না, দেখিলেই যেন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে, কতক্ষণে বাটীর বাহির হয়।" এই-রূপ কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। "কতক্ষণে আবার যতীনের সহিত দেখা হয়" এই ভাবনাই তাহার প্রবল

হইয়া উঠিল। যেদিন নিশিকান্ত গুলের ছোঁকা দিয়া তাহার গণ্ডস্থল পোড়ায়, সেইদিন হইতে উহার উপর রাধারাণীর অত্যন্ত বিষদৃষ্টি হয়। সেইদিনেই উহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কারণান্তর সাপেক্ষ থাকায়—লোভ সংবরণ করিতে না পারায় সেদিন তাহা করিতে পারে নাই। নিশিকান্ত সেই রাত্রেই এক ছড়া সুন্দর সোনার নেক্‌লেস্ আনিয়া রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিল। তখন উহার মাতাও অনেক বুঝাইল যে, "এখনকার বাজারে টাকার উপর টাকা, কাপড়ের উপর কাপড়, গহনার উপর গহনা, দেয় এরূপ মানুষ বিরল, যাহা করিয়াছ তাহাতে উহাকে আর কিছু বলিস্ না, আর বাছা তোরও'ত দোষ আছে।"

নিশিকান্তের অবস্থা এক্ষণে ভাল হইয়াছিল। পূর্ব্বে এমন দিনও গিয়াছে যে ঐ নিশিকান্তকে উহার মাতা নিজে গাড়ী ভাড়াব টাকা দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং অনেক সাহায্য করিয়াছে। রাধারাণীর ইহা অবিদিত ছিল না। সুতরাং রাণী জোর করিয়া এতদিন মনকে প্রবোধ দিত। এখন ভাবিল, "টাকা লইয়া কি হইবে? কাপড় লইয়া কি হইবে? যদি দিবানিশি মন জ্বলিতে লাগিল তবে এ ছার সুখ কিসের? আমি চাই যতীন। যতীনকে লইয়া সুখী হইব, ইহাতে যদি আমার অনশনে দিন যায়, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, এক বস্ত্রে আজীবন কাটাইতে হয়, আমার সেই ভাল, সেই আমার স্বর্গাপেক্ষা অধিক। আমি আর্থিক সুখ কিছুই চাহি না, যে প্রকারে

পারি যতীনকে বুকে ধরিব। বক্ষচ্যুত কখন করিব না। যদিও কষ্টে পড়ি তাহার মুখ দেখিয়া শান্তিলাভ করিব। যতীনের দাদামহাশয় বর্ত্তমান, উহার নিজের হাতে এখন কিছুই নাই। আমি সঙ্গীত বিদ্যাত কিছু জানি, না হয় নাচ মোজরো করিয়া উপায় করিব, না হয় থিয়েটার হইতে অনেকবার লইতে লোক আসিয়াছে তখন যাই নাই এখন যতীনের জন্য যাইব। আমার মাসে ২৫।৩০ টাকা কেহ ঘোচায় না, তাহা হইলে ত আর পরমুখাপেক্ষ হইয়া চলিতে হইবে না। যতীনকে লইয়া ইহজীবন সুখে কাটাইব।" এইরূপ স্থির করিয়া এক দিন নিশিকান্ত উহার বাটীতে আসিলে রাধারাণী তাহার সহিত মিছামিছি নানারূপ কেঁকড়া তুলিয়া মারামারি করিল। রাধারাণীর মা এবং বাড়ীর অন্যান্য লোক সকল আসিয়া অনেক বুঝাইল কিছুতেই বোধ মানিল না। অবশেষে নিশিকান্ত দূরীভূত হইল। নিশিকান্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার রাধারাণীর ঘরে ঢুকিল, ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর ক্যাস বাক্সে উহার প্রদত্ত সখের নেকলেস্ এবং অন্যান্য গহনা এবং একখানি সোনার বাটি ছিল উহা লইয়া চলিয়া গেল। নিশিকান্ত যাইবার সময় রাধারাণীকে শাসাইয়া গেল "দেখি, তুমি কেমন সুখে দিন কাটাও, যে আসিবে উহাকেই খুন করিয়া ফাঁসী যাইব, তোমাকে বিধি মতে জব্দ করিব তখন বুঝিবে আমি কত বড় বদমায়েস।"

রাধারাণী চীৎকার করিয়া বলিল, "গহনা লইয়া কোথায় যাইতেছ? যাবে, তুমি নিজে চলিয়া যাও, আমার

গহনার বাক্স রাখিয়া যাও, তা না হ'লে আমি এখনি পুলিসে চুরীর দাবী দিব।" নিশিকান্ত বলিল, "আমি ও সব ভয় করি না, যা ক'রতে পারিস্ করিস্।" তখন রাধারাণী দেখিল নিশিকান্ত কিছুতেই বাগ্ মানিল না, ভাবিল নিশিকান্ত একজন জেল ফেরত আসামী, বেশী বাড়াবাড়ি করিলে হিতে বিপরীত হইবে, তাহাতে আবার তাহার মানের ভয় নাই, পরে একটা হাঙ্গাম বাধিতে পারে, দূর হোক্ ও নিয়ে যাক্, অদৃষ্টে থাকে আবার হবে।" এই ভাবিয়া নিশিকান্তকে বলিল যে "তুমি এতদূর নীচ তাহা আমি জানিনা। বেশ্যাকে কত লোকে কত দেয় কিন্তু যাইবার কালে কেহ কখন জিনিস ফিরাইয়া লয় না। তুমি আবার কেন এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছ? আমার সাম্নে হ'তে দূর হইয়া যাও। গহনার বাক্স লইয়া যদি সুখী হও তাহা হইলে ঐ লইয়াই চলিয়া যাও। আর আমি কখন তোমার মুখ দর্শন করিব না।" নিশি চলিয়া যাইবার পর রাধারাণী তখনই মাধবকে একখানি চিঠি লিখিয়া যতীনের বাটীতে পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যতীনের অবস্থা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। পূর্ব্বের সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই, যেন সর্ব্বশরীর কালিমাবৃত। মনে শান্তি নাই, কেবলই চিন্তা-মেঘে ঢাকা। সেরূপ বেশভূষা নাই, দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রত্যহ যখন যা। খায় তখনি বমন করিয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া তাহার দাদামহাশয় ডাক্তার দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তারে কি করিবে? এ রোগে ডাক্তারের ঔষধ কিছুই খাটিল না।

যতীনের দাদামহাশয় প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার অদৃষ্টে কেন এরূপ কষ্ট ঘটিতেছে? উহার অসুখে আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। আজ বাদে কাল যতীন আমার বি,এ, পাশ করিবে বটে, কিন্তু তার চেয়ে যদি মূর্খ হইয়া সুস্থ শরীরে থাকিত সেও আমার পক্ষে ভাল ছিল; এক্ষণে কি করি?" যতীন রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার

পর হইতে সদাই বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে, চকিতের ন্যায় রাধারাণীর বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে প্রণয়িণীকে দেখিয়া আইসে, এবং মধ্যে মধ্যে চুণিকে রাধারাণীর সংবাদ জানিতে পাঠায়। রাধারাণী যতীনকে তাহার বাটী আসিতে অনেক অনুরোধ করে; কিন্তু যতীন (লোক লজ্জার ভয়েই হউক কিম্বা বাড়ীর ভয়েই হউক) ঐ বাটীতে আর যায় না; কিন্তু পরস্পরের প্রেম-পত্র এবং সেই গোলাপ জল দেওয়া পান মাধবের দ্বারা বাগানে নিত্যই আনীত ও প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে যতীন বাটী হইতে বাহির হইত না। এক্ষণে প্রত্যহ প্রাতে এবং বৈকালে বেড়াইবার ছল করিয়া বাটীর সম্মুখে বেড়াইতে যায়। রাধারাণীও সকালে বৈকালে তৃষিতা চাতকীর ন্যায় যতীনের দর্শন-পিপাসায় পিপাসিত হইয়া বারেন্দায় কিম্বা ছাদে প্রতীক্ষা করে। এইরূপে কিছুদিন কাটিল। যতীন রাধারাণীর বাটীতে যাইত না বটে; কিন্তু রাধারাণী মধ্যে মধ্যে কোন রকম সুবিধা করিয়া যতীনের সহিত গাড়ী করিয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা, ইডেন-গার্ডেন, কালিঘাট, সর্ব্বমঙ্গলার তলা এবং বাগানে যাইত। একদিন কোন বাগানে রাধারাণী পীড়াপীড়ি করিয়া যতীনকে তালের রস খাইতে লইয়া যায়। পরে যতীন ও রাধারাণী উভয়ে রস খাইয়া এত উন্মত্ত হইয়াছিল যে, সেই বাগানের খোয়ার রাস্তার উপর আমোদে শয়ন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে—তাহাতে উভয়ের কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব হয় নাই।

এইরূপ আমোদেও কয়েক মাস কাটিল। একদিন যতীন নিজের বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছে, এমন সময় মাধব আসিয়া একখানি পত্র দিল। তখন বেলা ছয়টা। যতীন চিঠি পাইয়া আনন্দে খুলিল, পরে পাঠ করিয়া বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইল। পত্রখানিতে লেখা এই—

প্রাণের!

আমি নিশিকান্তকে অদ্য তাড়াইয়াছি। তুমি যত শীঘ্র পার একবার আসিয়া দেখা দিয়া আমার তৃষিত প্রাণ শীতল করিয়া যাইবে। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মা ভাত খাইতে বলে, আমি কেবল ভাতের নিকট একবার উপরোধে বসিতে হয় বসি—এই পর্য্যন্ত। কতদিনে দুজনে একত্র হইব এই চিন্তাই আমার মনে সর্ব্বদা জাগিতেছে। জগদীশ্বর যদি কখনও দিন দেন, তাহা হইলে এ কষ্টের শান্তি পাইব।

তোমারই

হতভাগিনী

রাণী।

যতীন পত্রখানি মুড়িয়া পকেটে রাখিল; কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে মাধবকে বলিল "তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি।" মাধব চলিয়া গেল। যতীন ভাবিল, চুণিকে একবার ডাকিতে বলি, আবার ভাবিল—না, সে আসিলে বিপক্ষতাচরণ করিবে। চুণি যতীনের অবস্থা দেখিয়া কিরূপে রাধারাণীর

সহিত ছাড়াছাড়ি হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। যতীন তাহা জানিত। জানিত বলিয়াই চুণিকে না ডাকাই সাব্যস্ত করিল। অবশেষে নানা চিন্তার পর চাকরকে ডাকিল, চাকরের নিকট হইতে পঞ্চাশটী টাকা লইয়া একখানি ধূসর বর্ণের মলিদা গায়ে জড়াইয়া বাহিরে আসিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চাকর আসিল এবং বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইতেছেন? কর্ত্তাবাবু ডাকিলে কি বলিব?" যতীন বলিল "বলিস্ চুণি বাবুর বাড়ী গিয়াছে, এখনি আসিবে।" এদিকে রাধারাণী যতীনকে পত্র পাঠাইয়া ভাবিতেছে— যতীন কি আসিবে? একবার মনে হইতেছে "না" কিরূপে আসিবে? সে কি এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবে? কখনই না, কেননা সে এখন স্বাধীন নয় পরাধীন, উহার দাদা-মহাশয় এখনও জীবিত। আমি যেমন ভালবাসি, বোধ হয়, সে সেরূপ ভালবাসে না; যদি বাসিত তাহা হইলে এতক্ষণ পাখীর মত উড়িয়া আসিত। উহার অদর্শনে আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়।" পরক্ষণে আশা আসিয়া কর্ণে মধুর বচনে বলিল, "যতীন আসিবে, যতীন আসিবে; অলীক ভাবিতেছ, যতীনও তোমাভিন্ন জানে না।" এমন সময় মাধব আসিয়া উপস্থিত। রাধারাণী মাধবকে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল "বাবুর দেখা পাইয়াছিস্?" মাধব বলিল "আমি দেখা পাইয়াছি এবং পত্রও দিয়াছি।" রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিল"? মাধব বলিল

"তুমি যাও আমি শীঘ্র যাইতেছি।" রাধারাণীর হৃদয়ে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মনে মনে ভাবিতে লাগিল—পত্রের জবাব দিল না কেন? মুখে কেবল বলিয়া দিল "যাইতেছি" ইহার কারণ কি? এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। আশায় বুক বাঁধিয়া রাধারাণী সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল যে সম্মুখে "আমারি যতীন"—আনন্দে বিভোরা হইয়া ছুটিয়া যাইয়া যতীনের হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া আসিল। যতীন মাধবকে বিদায় দিবার পর টাকা লইয়া বাড়ী হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছে; কাজেই হাঁপাইতে লাগিল, কথা কহিতে গেল—পারিল না। শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল দেখিয়া রাধারাণী বলিল "আমার জন্য কত কষ্টই ভোগ করিতে হইতেছে। আহা! তুমি ভারি দৌড়ে এসেছ।" এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখের দর-বিগলিত ঘর্ম্ম মুছাইল, গায়ের কাপড়-খানি খুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। একটু স্থির হইয়া যতীন বলিল, "রাণি! তুমি নিশিকান্তকে কি সত্য সত্যই তাড়াইয়াছ?" রাধারাণীর মুখ রক্ত-বর্ণ হইল, গম্ভীর স্বরে বলিল "আমি কি তোমার নিকট ভাণ করিতেছি, আমার বোধ হয় তুমি এখনও আমাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস কর না।" যতীন বলিল "রাণি। আমায় কেন অপরাধী করিতেছ, আমিত তাহা ভাবিয়া, বলিতেছি না, আমি ভাবিতেছি যে আমি তোমার বাটী আসিনা বলিয়া বোধ হয় তুমি আমাকে আনিবার জন্য এই কৌশল

করিয়াছ।” রাধারাণী বলিল “আমি সত্যই উহাকে তাড়াইয়াছি, তাহা না হইলে আমি এত নির্ভয়ে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি। কৌশল কেমন তাহা জানি না, আমি তোমার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, আমি তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে পারি। আমি ধন চাহিনা, মান চাহিনা, জন চাহিনা, বাড়ী চাহিনা, বসন ভূষণ চাহিনা, কেবল চাই তোমাকে। তুমি কি আমার হবে?” যতীন বলিল “হবার আর কি বাকী আছে, রাণি? তুমি কি দেখ্‌ছনা তোমার জন্য আমার শরীর পাত করিছি, লোকলজ্জা জলাঞ্জলি দিছি, প্রাণের স্বসার দাম্পত্য প্রণয় অকাতরে তোমার চরণেই উৎসর্গ করিছি। আর আমার কি আছে? তুমি আর কি আশা কর?” রাধারাণী বলিল “আমায় স্পর্শ করিয়া বল আমি তোমার।” যতীন উত্তর করিল “আচ্ছা আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আমার হবে? আমি তোমাকে কখন বেশ্যা বলিয়া জানিনা। আমার চক্ষে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী অপেক্ষা অধিক। যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ, তোমায় পাইয়া সে শোক ভুলিয়াছি, আর আমি কিছুই চাহি না, তুমি একবার বল “আমি তোমারি।”

রাধারাণী যতীনকে বক্ষে জড়াইয়া যতীনের বক্ষে মস্তক রাখিয়া যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল এবং বলিল, “আমি তোমারি” এ জন্মে

আর কাহারও হইব না—এই আমার শেষ; জানিনা ঈশ্বরের মনে কি আছে।"

যতীন রাধারাণীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিল, দু এক ফোঁটা প্রেমাশ্রু পড়িল। রাধারাণীর হৃদয়েও তপ্ত অশ্রুজল পড়িল, শরীর কণ্টকিত হইল। যতীন প্রত্যুত্তরে কম্পিত স্বরে বলিল "আমি তোমারি!" "আমি তোমারি" "আমি তোমারি"। রাধারাণী বলিল "যদি তুমি আমার, আমার কথা শুনিতে হইবে, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।" যতীন বলিল "আমি তোমায় কোথায় লইয়া যাইব?" রাধারাণী কহিল "আমি শত্রু-বেষ্টিতা, আমার মা শত্রু, ভগিনী শত্রু, আমার সকলে শত্রু, ইহ জগতে আপনার বলিবার কেহই নাই। সকলেই আমায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বলে, আমি নিশিকান্তকে তাড়াইয়াছি, তাহারা সেই নিশিকান্তকে লইয়া পুনর্ব্বার থাকিতে বলে। তাহারা ধনলোভে অন্ধ। যাহা প্রাণ চায় না, তাহা কি প্রকারে করিব? যদি তুমি অদ্য আমাকে এখান হইতে না লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব।"

যতীন দেখিল বিষম বিভ্রাট, ভয়ানক জিদ্ করিতেছে; কিরূপে ইহাকে নিবৃত্ত করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভাবিল বাটী হইতে বাহির হইয়া কখন রাত্রি যাপন করি নাই, কিরূপে ইহাকে লইয়া যাইব? মনোমধ্যে

নানাপ্রকার যুদ্ধ চলিতে লাগিল, হঠাৎ বাগানের কথা মনে আসিল, স্থির হইল যে আর কোথায় যাইবে, রাধারাণীকে লইয়া বাগানে যাওয়াই উত্তম। রাধারাণীকে বলিল, "আমাকে যাহা করিতে বল আমি করিব। তবে আমি একাকী যুবতী রমণী লইয়া এ গভীর রজনীতে কোথায় যাইব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?" রাধারাণী বলিল "শ্মশানে যাইব, দুজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ফিরিব। এ জগতে এ অভাগা অভাগিনীর স্থান কোথায়?" এই কথা শুনিয়া যতীনের প্রাণ উদাস হইয়া গেল। যতীন বলিল "আচ্ছা তাহাই করিব।" রাধারাণী বলিল "তুমি অগ্রে বাড়ীর বাহির হইয়া যাও; পাছে তোমার উপর কেহ দোষা-রোপ করে এইজন্য বলিতেছি। আমার প্রাণের সই বসন্তের বাটী নিমন্ত্রণ, মার নিকট এই কথা বলিয়া আমি পরে চলিয়া যাইব। তুমি গাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিবে। আমি যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।"

যতীন "তাহাই করিব" বলিয়া রাধারাণীর নিকট বিদায় লইয়া উন্মাদের ন্যায় বাটী হইতে চলিয়া গেল। কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে—কিছুই জ্ঞান নাই। উপর হইতে নামিতে নামিতে দুই তিনবার পদস্খলন হইয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। ক্রমে বাটী হইতে রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত; কোন্‌দিকে যাইবে কিছুই জ্ঞান নাই, একদিক্ ধরিয়া চলিল। কিছুক্ষণ চলিলে পর একটু প্রকৃতিস্থ হইল। সম্মুখে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী যাইতেছিল; যতীন গাড়োয়ানকে

জিজ্ঞাসা করিল আলমবাজার যাইতে কি ভাড়া নিবি?" গাড়োয়ান বলিল, "ভাড়া একটাকা দিতে হবে" যতীন কহিল "আচ্ছা তাই পাবি।" গাড়োয়ান কহিল "শোয়ারী কোথায়?" যতীন গাড়ীতে উঠিয়া বসন্তের বাড়ীর দিকে চলিল। এদিকে যতীন চলিয়া যাইবার পর রাধারাণী মাকে ডাকিয়া বলিল "মা! আজ সকালে আমার সই বসন্ত নেমন্তন্ন ক'রে গেছে, আমি সেখানে চল্লুম।" এই বলিয়া মাধবকে ডাকিল। মাধব একটী আলো লইয়া আসিল। রাধারাণী একখানি ভাল কাপড় পরিয়া চটিজুতা পায়ে দিল। মাধব আলো দেখাইতে লাগিল, রাধারাণী সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিল। মাধব একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিল, রাধারাণী গাড়িতে উঠিল। গাড়ীখানি কিছুক্ষণ পরে বসন্তের বাটীতে পঁহুছিল। সেইস্থানে যাইয়া দেখে আর একখানি গাড়ী বসন্তের দ্বারে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতরে কেহ আছে কিনা জানা গেল না। রাধারাণী ভাবিল, আর কেহ নহে, নিশ্চয় "যতীন।" সেই গাড়ী হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল "যতীন!" অন্য গাড়ী হইতে উত্তর হইল "রাণি এসেছ?" এই সকরুণ কথা শুনিয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীনা প্রেমবিহ্বলা রাণী লম্ফ দিয়া যতীনের গাড়ীতে উঠিল। তখন উভয়ের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু সে আমোদেও বাধা ছিল। তাই উভয়ের হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত ভয় দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণপরে উভয়ে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আর কাল বিলম্ব যুক্তি সিদ্ধ

নয় ভাবিয়া যতীন মাধবকে চারিটী টাকা বক্‌সিস্ দিয়া বিদায় দিল, বিদায় কালে রাধারাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "মাধব সাবধান! যেন একথা প্রকাশ না হয়।" "দিদিবাবু! আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি সেরূপ নহি।" এই বলিয়া মাধব তাহাকে সাহস দিয়া বিদায় লইল। এদিকে তাহাদের গাড়ীখানি গড় গড় করিয়া চীৎপুর রাস্তা দিয়া উত্তর মুখে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর গভীরা রজনী, যতীনের দাদা মহাশয় নফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যতীন বাড়ী আসিয়াছে?" নফর বলিল "এখনও আসেন নাই, চুণিবাবুর বাড়ী গিয়াছেন।" তখন রাত্রি ক্রমে বাড়িতে লাগিল দেখিয়া বৃদ্ধের প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, নফরকে বলিল, "বাবা নফর! একবার চুণি বাবুর বাড়ীতে খোঁজ লও, যদি যতীন সেখানে থাকে, উহাকে একেবারে সঙ্গে করিয়া সত্বর লইয়া আসিবে। আমার যতীনকে না দেখিলে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে।" নফর কর্ত্তার এই কথা শুনিয়া চুণি বাবুর বাটীতে যাইল, তথায় যাইয়া দেখে বাটীর সদর দরজা রুদ্ধ, সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ পাইল না। নফর উচ্চৈঃস্বরে "চুণি বাবু" "চুণি বাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কোন উত্তর পাইল না দেখিয়া, দরজার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে

লাগিল, ঐ ভয়ঙ্কর খড় খড়ানি শব্দে গৃহস্থিত কেহ জাগরিত হইয়া উত্তর করিল "কে গা?" নফর উত্তর দিল, "চুণি বাবু বাড়ী আছেন কি? তাঁহার নিকট বিশেষ দরকার আছে। আমি যতীন বাবুর বাড়ী হইতে আস্‌ছি।" চুণি তখন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, বাড়ীর লোক ডাকাডাকি করিয়া উঠাইয়া দিল। চুণি অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় নিচে আসিয়া চোক মুছিতে মুছিতে দরজা খুলিয়া নফরকে জিজ্ঞাসা করিল "কিহে নফর! যতীন ভাল আছে ত? তাহারত কিছু হয় নাই?" নফর বলিল, "যতীনবাবু সন্ধ্যার সময় আপনার বাড়ী যাই বলিয়া এসেছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরেন নাই, কর্ত্তাবাবু বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, নিদ্রা যাওয়া দূরে থাকুক, আহার পর্য্যন্তও হয় নাই, চুপ করিয়া কত কি ভাবিতেছেন। এখন যতীনবাবু কোথায়?" চুণি আকাশ হইতে পড়িল, বলিল "সে কি নফর? আজ আদতে আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই, তবে কোথায় গেল? আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও, আমি দেখি যদি কোথাও সন্ধান পাই, তাহা হইলে আমি নিজে তোমাদের বাড়ীতে খবর দিয়া আসিব।" নফর গিয়া কর্ত্তাবাবুকে ঐরূপ সংবাদ দিল, তিনিও ঐ আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চুণি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া শীঘ্র করিয়া একখানি মোটা গায়ের কাপড় জড়াইয়া জুতা পরিয়া নামিয়া আসিল। চুণির মাতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'য়েছে?

এরূপ অবস্থায় কোথায় যাচ্চিস্?” চুণি বলিল, “যতীনের দাদামহাশয় কিজন্য ডাক্‌ছেন জানিনা, তুমি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দাও।” চুণির মাতা “কহিল তা'ত নয় আমি শুন্‌লেম যে যতীন কোথায় গিযেছে, এখনও বাটী আসে নাই, এই কথা চাকর ব'ল্‌ছিল।” চুণি, মার কথা চাপা দিয়া বলিল, “আমি শীঘ্র আস্‌ছি তুমি ভাবিও না” বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চুণির মাতা ও সদর দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিল। চুণি রাস্তায় আসিযা ভাবিল “যতীন আর কোথাও যায় নাই, নিশ্চযই রাধারাণীর বাটী গিয়াছে। এখন যতীন আমার কাছে রাধারাণীর কথা গোপন রাখে, পাছে আমি যাইতে না দি, তাই আমাকে না বলিয়া একাকী গিয়াছে।” পথে আসিতে আসিতে যতীনের ভূত ও বর্ত্তমান অবস্থা মনে আন্দোলন করিতে লাগিল কি উপায়ে ইহাকে ফিরাইব—ইহার প্রতীকার করিব, ভাবিল অগ্রে ইহার সন্ধান করি, পরে বিবেচনা করিব। চুণি অতি শীঘ্রই রাধারাণীর বাটী আসিয়া উপস্থিত, দেখিল সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, একেবারে অন্ধকারের ভিতর দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, দেখিল সকলেই ব্যস্ত ও বলাবলি করিতেছে রাধারাণী কোথায় গেল? কেহ আসিতেছে, কেহ ছুটিতেছে, একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু রাধারাণীর মাতাকে দেখিতে পাইল না। চুণির দিকে কেহ লক্ষ্য করে নাই। চুণি দেখিল সেখানেও যে কাণ্ড এখানেও সেই কাণ্ড চলিতেছে,

থতমথ খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাধারাণীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উহার মাতা বসন্তের বাটী লোক পাঠাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল "রাধারাণী এখানে আসে নাই।" মাধবকে কড়কাইল, মাধব কঠিন দিব্য করিয়া বলিল "আমি সেই বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি" রাধারাণীর মাতা দেখিল ব্যাপার চমৎকার! মর্ম্মভেদ হুরূহ!! বিশ্বাস হইল না। রাধারাণীর মাতা, রাধারাণীর ছোট ভগিনীর বাবুর বন্ধু সুরেনকে সঙ্গে লইয়া বসন্তের বাটীতে আসিল, পথিমধ্যে নিশিকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন নিশিকান্ত অর্দ্ধমত্তাবস্থায় রাধা-রাণীর মাতাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "মা! মা! তুমি এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?" উহার মাতা কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল "আমার জ্বালার উপর জ্বালা, আর বাছা আমার অদৃষ্টে আরও কত যন্ত্রণা আছে তাহা ব'ল্‌তে পারি না। আমার রাধারাণী কোথায় চ'লে গেছে।" নিশিকান্ত এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী কথা মার মুখে শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল, "মা আমি নিজে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি কোন ভয় করিও না, কোথায় যাবে?" নিকটেই বসন্তের বাড়ী, রাধারাণীর মাতা ডাকিল, "মেয়ে! জেগে আছিস্?" "কেগা—মাসী?" এই বলিয়া বসন্ত বারাণ্ডায় আসিল, বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল "এত রাত্রে কেনগা মাসী? কি দরকার?" রাধারাণীর মাতা বলিল "আমার রাণী এখানে এসেছিল?" বসন্ত বলিল "কই 'আজ'ত সে আসে নাই, অনেক দিন হ'ল একবার এসেছিল।" রাণীর মাতা বলিল

"সে কি বাছা তোর বাড়ী নেমন্তন্ন ব'লে এসেছে, তুই আজ আমাদের বাড়ী সকালে গিয়াছিলি, আমি তখন বাড়ী ছিলাম না।" বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল "সে কিগো মাসী! আমি যে তোমাদের বাড়ী অনেক দিন যাই নাই, তবে এখানে সে আসে নাই আর কোথায় গি'য়েছে খোঁজ কর।"

রাধারাণীর মাতা হতাশ হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিয়া কোথাও কিছুই সন্ধান না পাইয়া নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

চুণি সবেমাত্র সেখানে গিয়াছিল, উহার মাতা উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে গা?" চুণি কহিল "যতীন এখানে এসেছিল?" উহার মাতা কহিল, "সে সন্ধ্যার সময় একবার দেখা দিয়েছিল, যতীন বাড়ী হইতে বাহির হইবার পর, রাধারাণী নেমন্তন্নে যাই বলিয়া চলিয়া গিয়াছে এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। অনেক বাড়ী খুঁজে এলুম, কোথাও সন্ধান পেলুমনা।"

চুণি চমকিত হইল এবং মনে মনে ভাবিল, "সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আর চিন্তা নাই—দুজনেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায় গেল তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই। এখন বৃদ্ধের নিকট এ সংবাদ কি প্রকারে দিব কিছুই ঠাওরাইতে পারিতেছি না, যাহা ভাল বোধ হয় যাইয়া বলিব।" চুণিকে নিরুত্তর দেখিয়া রাণীর মাতা তাহাকে বলিল, "বাবা! যদি যতীনের নিকট আমার রাণীর কোন সন্ধান পাও অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিও।" চুণি হতাশ হইয়া

যতীনের বাটীতে আসিয়া দেখিল তখনও বৃদ্ধ জাগিয়া আছেন। তখন অগত্যা বৃদ্ধকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য সংবাদ দিল যে "যতীনের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, সে কোন বন্ধুর সহিত মেলা দেখিতে গিয়াছে, তিন চারি দিন বাদে আসিবে।" যতীনের দাদামহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, "যে আমার যতীন পূর্ব্বে ত এরূপ ছিল না আজ প্রায় একমাস হইল এরূপ হ'য়েছে, সে ত আমার আজ্ঞা ব্যতীত কখনও একপাও কোথায় নড়িত না। আমার দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে"

যতীনের সংবাদ দুই তিন দিনের মধ্যে বহু চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে চুণি সে রাত্রির মত গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। দুই তিন দিন কাটিল, রাধারাণার মাতা রাধারাণীর কিছুই খবর পাইল না, কোথায় গেল? কাহার সহিত গেল? জীবিতা কি মৃতা? কিছুই সন্ধান পাইল না। যাহাকে দেখে সকলকেই জিজ্ঞাসা করে, আমার রাধারাণীকে দেখিয়াছ? কিন্তু কাহারও নিকট মনোমত উত্তর মিলিল না। এইরূপ মনোকষ্টে তিনদিন কাটিল।

চতুর্থ দিবসে রাধারাণীর মাতা, প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছে এমন সময় উহার ছোট জামাতা আসিয়া খবর দিল যে রাধারাণীর খবর পাওয়া গিয়াছে, সে যতীনের সহিত বাগানে আছে। বামনের, চন্দ্র হস্তে পাইলে যেরূপ আহ্লাদ—চিরকাঙ্গালিনী, রাজরাণী হইলে

হইলে যেরূপ উঁহার মনে আনন্দ হয়—সেইরূপ রাধারাণীর মাতা আহ্লাদে গলিয়া পড়িল। রাধারাণীর মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "যতীনের বাগান কোথায়?" জামাই উত্তর করিল, "আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি বাগান কামারহাটী কিম্বা আগোড়পাড়া হ'বে, কিন্তু যতীনের সঙ্গে গিয়াছে এ কথা ঠিক্।" তখনি একখানি গাড়ী আনান হইল, রাধারাণীর মাতা, ছোট কন্যা ও ছোট জামাতা তিন জনে একত্রে রাধারাণীর উদ্দেশে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে যতীন যখন গাড়ী করিয়া রাধারাণীকে বাগানে লইয়া যায়, পথিমধ্যে বোর্ণিওকোম্পানীর কলের নিকট গাড়ীর চাকা খুলিয়া যায়। তখন রাত্রি প্রায় ৯ নয়টা, দৈববলে দুজনেই গাড়ী হইতে পড়িয়া যায়, কিন্তু যতীন রাধারাণীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। যতীনের হাতে এবং পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু যতীন সে আঘাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। এমন কি রাণীকেও তাহা জানিতে দিল না, গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া সেই গভীর রাত্রে নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জনশূন্য পথ দিয়া রাধারাণীর হাত ধরিয়া বীরের মতন চলিতে লাগিল। যতীন পরমেশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল "আমার শরীরে লাগিয়াছে সেজন্য দুঃখিত নহি। রাধারাণীর অঙ্গে যে কোন আঁচড়ও

লাগে নাই সেইআমার পক্ষে যথেষ্ট।" রাধারাণী ভাবিতে লাগিল যতীনকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে কিন্তু যতীন আমার নিকট মানিতেছে না বার বার বলিতে লাগিল যতীন তোমায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু যতীন আমার নিকট মানিতেছে না, বারবার বলিতে লাগিল যতীন তোমায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। আমি বড় অভাগিনী, এ অভাগিনীকে যে কোলে টানে তার পদে পদে বিপদ। জগদীশ্বর আর কত দুঃখ দেবে। যতীন একটু হাসিয়া বলিল না রাণি! তুমি অত কিন্ত হ'চ্ছ কেন? আমার কিছুই লাগে নাই, বাগান অতি নিকটেই ছিল আসিয়া পৌছিল। যতীন এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছিল, উহা এত কষ্টের মধ্যেও কোন যাতনা তাহার মনে অনুভব হয় নাই। সে কেবল রাধারাণী সঙ্গে ছিল বলিয়া।

বাগানে মালীরা নিদ্রিত, যতীন উচ্চৈঃস্বরে মালীকে ডাকিল। দূর হইতে ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটী আলো দেখিতে পাইল, আলোটী মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, একজন মনুষ্য আলো লইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল; ক্রমে আলো নিকটবর্ত্তী হইলে যতীন দেখিল সম্মুখে মালী উপস্থিত। মালী বাগানের ফটক খুলিয়া দিল এবং যতীনবাবুকে একটী প্রণাম করিল। পরে উভয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। মালী আগে আগে আলো দেখাইয়া লইয়া চলিল। তিনজনে একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। বাগানের কক্ষটী

পূর্ব্বে ভালরূপ সাজান ছিল বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু এক্ষণে অযত্নে অব্যবহারে পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; এবং গৃহ সামগ্রী সকল অপরিষ্কৃত ও অসংলগ্নরূপে সংরক্ষিত।

যতীনের পিতা অত্যন্ত সৌখীন ছিলেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তিনি প্রত্যহই বাগানে আসিতেন, সেজন্য তখন বাগানের শ্রী, ও সুন্দর ছিল। তাঁহার পরলোক গমন হইলে কেহই যতীনের বাড়ী হইতে কখন বাগানে আসে না সেজন্য এরূপ শ্রীহীন অবস্থা।

রাধারাণী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মালীর হস্ত হইতে আলোটী লইয়া যতীনের অঙ্গ পরীক্ষা করিল, দেখিল হাত ও পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝুঁঝিয়া পড়িতেছে। রাধারাণী শিহরিয়া উঠিল, যতীনকে বলিল "যতীন!" আমার জন্য তুমি এত কষ্ট সহ্য করিতেছ? ভগবান! তোমার এ অবস্থা না দেখা ভাল ছিল। পথে আজ আমার কেন মৃত্যু হ'ল না। এ দৃশ্য আর আমার চক্ষে দেখিতে পারি না। ভগবান! অভাগিনী তোমার চরণে এত কি অপরাধ করিয়াছে যে পদে পদে আর কত বিপদ ঘটাইবে? "যতীন" কহিল রাণি! তোমার মৃত্যুর কথা আর কখন মুখে আনিও না, যে কষ্ট আমার স্বচক্ষে দেখিতেছ ইহা আমার তুচ্ছ। তুমি নিকটে থাকিলে আমার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই, কিছুতেই আমায় কাতর করিতে পারে না, স্বর্গের কি সুখ তাহা আমি জানিনা, কিন্তু তুমি কাছে থাক তাতে আমার মনে যে কি আনন্দ হয়, বোধ হয় স্বর্গবাসীরাও

সে আনন্দ উপভোগ করে নাই।" রাধারাণী ব্যস্ত হইয়া মালীকে শীঘ্র জল আনিতে বলিল, মালী তখনই জল আনিয়া দিল, রাধারাণী স্বীয় অঞ্চল ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া যতীনের ক্ষত স্থান মুছাইয়া দিল। পুনরায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে জড়াইয়া দিল। যতীন মালীকে একটী টাকা দিয়া বলিল "কিছু খাবার বাজার হইতে লইয়া আইস" মালী বাজারে চলিয়া গেল। পরে রাধারাণী যতীনের হাত ধরিয়া পর কক্ষে যাইল, দেখিল একখানিশয্যাবিহীন খাট পড়িয়া রহিয়াছে, দুই একখানি ছবি আছে। যতীন কহিল এই গৃহে আমার পিতা শয়ন করিতেন। সম্মুখে আর একটী ঘরে ঢুকিল, ঐ ঘরটীতে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙান আছে। একখানি "ডিউক-অব্ ওয়েলিংটন শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতামহের নিকট পাঠ করিতেছেন" আর একখানি ছবি "নেপোলিয়ন বোনাপার্টী সৈন্য-দিগকে উত্তেজিত করিতেছেন।" আর একখানি "রোমিও জুলিয়েট্ বাগানের প্রাচীরের উপর উঠিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করিতেছেন" আর একখানিতে "রোমিও জুলিয়েটের কবরে বিষপানে মৃত্যু।" যতীন একে একে রাধারাণীকে সমুদয় ছবিগুলি দেখাইল। রাধারাণীর অন্য কোন ছবি দেখিয়া মন আকর্ষিত হয় নাই, কেবল রোমিও জুলিয়েটের মৃত্যু ছবি দেখিয়া তাহাদিগের বিষয় জানিতে উৎসুক হইল। যতীনকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ও বলিল "তুমিত এসব পুস্তক পড়িয়াছ। আমাকে এই ছবির বিষয় ভালরূপে গল্প

করিয়া বুঝাইয়া দাও" যতীন অগত্যা সম্মত হইয়া গল্প আরম্ভ করিল। গল্প শুনিতে শুনিতে রাধারাণী মুগ্ধ হইয়া গেল। গল্প শেষ হইলে রাধারাণী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "যতীন! আমাদিগের ভালবাসা কি এত-দূর হইবে? এরূপ ভালবাসা ত জগতে কথন শুনি নাই দেখি নাই।" যতিন বলিল "তুমি এই ভালবাসাকে এতদূর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের ভালবাসা ইহা অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর। তুমি সামান্য মানব শক্তিতে ইহা বুঝিতে পারিবে না। তুমি যে এ ছবিকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ বোধ হয় আমাদিগের পরস্পরের এই জীবন্ত ভালবাসা দেখিয়া যাহার বুঝিবার শক্তি আছে তাহাকেই মানিতে হইবে যে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর! তুমি অবলা! দেখ রোমিওর লোক লজ্জা ছিল, গুরুভয় ছিল, প্রাণের জিনিষ প্রাণে রাখিবে তাহা পারে নাই, এ'ত হীন প্রাণের কথা—এত কাপুরুষতার কথা—কিন্তু তুমি আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া—মাতা ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া—লোক লজ্জা অপবাদ গুরুভয় পদদলিত করিয়া—তোমার হৃদয়নিধি হৃদয়ে ধরিয়াছ এই তোমার সৎসাহসের জলন্ত দৃষ্টান্ত—তোমার কাপুরুষতার লেশ মাত্র নাই, অতি হীন বুদ্ধির ও প্রতীয়মান হইবে যে রোমিও শ্রেষ্ঠ, কি তুমি শ্রেষ্ঠ, আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না।" যতীন যখন এই সকল বুঝাইতেছিল রাধারাণী মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় যতীনের মুখশ্রীরপ্রতিএকদৃষ্টে চাহিয়া

রহিয়াছিল। মালী বাজার হইতে ফিরিল। "বাবু বাবু" বলিয়া ডাকিল। উভয়ের চমক ভাঙ্গিল, দেখিল সম্মুখে মালী উপস্থিত। যতীন মালীকে জিজ্ঞাসা করিল কি খাবার আনিয়াছ? মালী উত্তর করিল "বাজারের সকল দোকান বন্ধ, অনেকের ঝাঁপ টানিলাম, কেহই খুলিল না, অবশেষে অনেক কষ্টে কোন দোকান হইতে একটু মুড়ি মুড়কী এবং গজা আনিয়াছি।" অতি দুঃখের সময় মনুষ্যের যেরূপ হাসি আইসে সেইরূপ যতীন ও রাধারাণীর হাসি আসিল, কহিল "একটু জল আনিয়া দাও।" মালী বলিল "বাবু আমার কাছে একটা নারিকেল আছে।" যতীন একবার রাধারাণী মুখের দিকে চাহিয়া মালীকে বলিল "আচ্ছা নিয়ে আয়।" মালী নারিকেল ভাঙ্গিয়া এবং জল আনিয়া খাবার আয়োজন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মালী জিজ্ঞাসা করিল "বাবু বিছানাত এখানে কিছুই নাই, কেমন করিয়া শুইবেন এবং এ রাত্রে কোথায় যাইয়া আনিব?" যতীন বলিল "আচ্ছা তুই এখন যা, যা হয় পরে হবে।" উভয়ে একত্রে বসিয়া চাদর হইতে মুড়ি মুড়কী গজা এবং মালী প্রদত্ত নারিকেলের শাঁস দুজনে একটু মুখে দিল, পরে জলপান করিয়া সে রাত্রের মত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। যে কক্ষে তাহারা বসিয়াছিল সেই স্থানে একখানি শতরঞ্চি পাতা ছিল, যতীন শুইল, যতীনের হস্তের উপর রাধারাণী মস্তক রাখিয়া শুইল, এবং যতীনের সেই ধূসর বর্ণের মলিদা দুজনে গায়ে ঢাকা দিয়া সমস্ত রাত্রি আমোদে কাটাইল।

দারুণ শীত কিছুই অনুভূত হইল না। নিদ্রাও আসিল না। নানারূপ কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে উষা দেখা দিল। বিধিনিয়ম কে রোধ করে। কাহারও কথা কেহ মানে না। কাক কোকিল যাহা ডাকিবার ডাকিল। ক্রমে দিনমণি রক্তিম বর্ণ ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, চতুর্দ্দিকে সহস্র কিরণ ছড়াইয়া দিল, যেন জানাইতেছে যে, শ্রমজীবী কে কোথায় নিদ্রিত আছ জাগরিত হও, নিদ্রাকাল ফুরাইয়াছে; ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জগতের প্রায় সমুদয় জীব জন্তুই জাগ্রত, নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছে। কিন্তু যতীন ও রাধারাণী ছয়মাস কাল এইরূপ কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া অদ্য ভাবনা-শূন্য পূর্ণ-শান্তির কোলে আরাম লইতেছে। উহাদিগের প্রাণে এখন সে নিশিকান্তের ভয় নাই, মাতার ভয় নাই, লোক লজ্জার ভয় নাই, গৃহ মনে নাই, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া প্রেম-সাগরে উভয়ে মগ্ন।

এস্থলে যতীনের ও রাধারাণীর এ সুখের প্রতিবাদী সূর্য্যদেব ভিন্ন কেহই ছিল না। এই নিঃসহায় প্রেমিক প্রেমিকার তরুরাজি সকল একমাত্র সহায় হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা সূর্য্যতেজ অবরোধ করিতেছে, তরুরাজি সকল কত অনুনয় বিনয় করিল নীহার ধারে অশ্রুবারি চলিল। শন শন শব্দে কহিতেছে দিনকর! নব প্রেমিক প্রেমিকার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিও না। এ সুখ মিলন আজিকার মত ভোগ করিতে দাও। দিনমণি মানিলেন না, ক্রমে বেগতিক দেখিয়া

ছাদের উপর আসিয়া দেখা দিল। এখানে আর কেহই প্রতি-দ্বন্দ্বী হইল না, ক্রমে দরজার ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া যতীন ও রাধারাণীর মুখের উপর পড়িল, অমনি উহাদিগের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যতীন বলিল "রাণি! ওঠ, আর কতক্ষণ শুইয়া থাকিবে? বেলা হইয়াছে, কলা কিছুই খাওয়া হয় নাই, এস সকাল সকাল স্নানাদি করিয়া উভয়ে খাবারের আয়োজন করি।" রাধারাণী বলিল, "আর একটু শোও।" যতীন বলিল, "দেখ রাণি! অনেক বেলা হইয়া যাইবে, কেন অবুঝ হইতেছ, ওঠ।" অগত্যা উভয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া সম্মুখে পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া বসিল। পুষ্করিণীর দুই পার্শ্বে দুটী বকুল বৃক্ষ, ঐ বৃক্ষের তলায় রাশি রাশি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে, রাধারাণী আচল ভরিয়া কুড়াইয়া লইল। এমন সময় মালী আসিয়া উপস্থিত। যতীন মালীকে আজ্ঞা করিল "আমাদিগের স্নানের আয়োজন করিয়া দিয়া, বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দাও।" মালী বাজারে চলিয়া গেল। রাধারাণী যতীনকে বলিল, "এস একবার বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়িয়ে আসি।" উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিল। রাধারাণী দেখিল বাগানটী নিতান্ত বড় নয়, মাজারি রকম একখানি সুন্দর বাগান। প্রথমতঃ অট্টালিকার প্রতি লক্ষ্য হইল। অট্টালিকাটি কেদারের উপর একতলা, সাম্নে গাড়ী বারেন্দা এবং দুই পার্শ্বে গোলাপ ফুলের কেয়ারী করা রহিয়াছে। ঐ গোলাপের কেয়ারী হইতে যতীন সুন্দর দুইটী গোলাপ

ফুল তুলিয়া রাধারাণীর খোঁপায় পরাইয়া দিল। যতীন ভাবিল গোলাপ সুন্দর, কি রাধারাণী সুন্দর, যতীনের মন কহিল, "আমার রাধারাণীই সুন্দর।"

এই উদ্যানে দুইটী অতি সুবিস্তৃতা পুষ্করিণী। তাহাদের জল অতিস্বচ্ছ কাক-চক্ষু-বিনিন্দিত, পুষ্করিণীদ্বয়ের মধ্যস্থলে আর একটী পুষ্পোদ্যান, তাহার মধ্যে মধ্যে লতা-মণ্ডপ, কোনটীতে লালবর্ণের ফুল, কোনটীতে বেগুনে রঙের ফুল, কোনটীতে শ্বেত বর্ণের ফুল, প্রত্যেক মণ্ডপ ভিন্ন-ভিন্ন, বর্ণের ফুলে পরিশোভিত। দুটী পুষ্করিণীতে সান বাঁধান ঘাট, সিঁড়িগুলি অতি সুন্দর, পরিষ্কার ও প্রশস্ত। চারিধারে আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লীচু, নারিকেল প্রভৃতি ফলকর গাছে সজ্জিত। শাখায় শাখায় নানাজাতি পক্ষী তান তুলিয়া প্রভাত গীত গাহিতেছে। কূজনে উদ্যান ছাইয়া ফেলিয়াছে। মল্লিকা, যূথিকা, মালতী, নানা প্রকার ফুল ফুটিয়াছে। উদ্যানটী সৌরভে আমোদিত, অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে উড়িতেছে, ফুলে বসিতেছে, চুমিতেছে ফুল-কুল সোহাগে গলিয়া এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। পিকবরের কুহু কুহু তানে বিরহীর প্রাণ ব্যথিত হইতেছে। যতীন ও রাধারাণীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। তাহাতে তাহাদের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। এইরূপ চারিদিক অবলোকনে মুগ্ধ হইয়া উভয়ে বেলা হইয়াছে দেখিয়া বাসগৃহে ফিরিল। তথায় মালী সমুদয় স্নানের উপকরণ রাখিয়া যাওয়ায় যতীন রাধারাণীকে বলিল, "এস

দুজনে স্নান করা যাক্।" রাধারাণী যতীনের কথা ঠেলিতে পারিল না। ক্রমে উভয়ে তৈল মাখিয়া পুষ্করিণীতে নামিল। রাধারাণী বলিল, "এস দুজনে সাঁতার দি।" যতীন ও রাধারাণী উভয়ে সাঁতার দিতে লাগিল, এইরূপে ক্ষণকাল জলক্রীড়া করিয়া উপরে উঠিল। বস্ত্রাদি ছাড়িয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া উভয়ে বৈঠকখানায় আসিল, কিছু মিষ্টান্ন জলযোগ করিল।

উভয়ে একত্রে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিল। রাধারাণী ও যতীন কখন এ কার্য্য করে নাই, আজ নূতন ব্রতী। উনুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, ভাত চড়াইয়া দিল, কিন্তু ক্রমে উনুন নিবিয়া যাইতে লাগিল। দুজনেই নূতন কার্য্যে ব্রতী; কেহই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। ধোঁয়াতে উভয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, উনুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এমন সময় মালী আসিয়া উপদেষ্টা হইল।

মালী জাতিতে ব্রাহ্মণ, রন্ধন কার্য্যে তৎপর ছিল। মালী বলিল "বাবু" আপনারা ঘরে যাইয়া বসুন আমি সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। উভয়ে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত। মস্তক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল। মালী সমুদয় প্রস্তুত করিয়া খাবার আয়োজন করিয়া ডাকিতে লাগিল। যতীন ও রাধারাণী উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছে যেন "এক বৃন্তে দুটী ফুল" উভয়ে আহার করিয়া উঠিল। এদিকে দিনমণি সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পশ্চিমাকাশে মিশাইয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত। পশ্চিম গগনে চন্দ্রমা নক্ষত্রদল সমেত দেখা দিলেন। স্নিগ্ধ

জ্যোৎস্নার প্রেমিক প্রেমিকার সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। চারিদিকে নানাজাতি ফুল ফুটিয়াছে, বাগান সৌরভে আমোদিত। যতীনের ক্রোড়ে রাধারাণী একটু শয়ন করিয়া আকাশের শোভা দেখিতে লাগিল। যতীন রাধারাণীকে একটী গান গাইতে অনুরোধ করিয়া বলিল "এমন জ্যোৎস্না রাত্রে উভয়ে কেমন আমোদে আছি, প্রাণ খুলিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছি, এক্ষণে কেহই আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।" রাধারাণী আহ্লাদে বলিল "এটা কি বেশী কথা হ'লো একটা সামান্য গান গাইবার জন্য এত অনুনয় বিনয় কেন করিতেছ," এই বলিয়া রাধারাণী একটী গান ধরিল—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি মধুর সাজে আজি সেজেছে যামিনী।
ভাসিছে প্রমোদে সবে, হাসিছে অবনী॥
সুনীল অম্বর গায়, সুধাংশু ভাসিয়া যায়,
তারকা হীরক-মালা পরিয়া গলায়,—
মৃদুল মলয়ানিলে, সরসী জল উছলে
চকোর চকোরী খেলে হাসে কুমুদিনী॥
পিককুল কুহু রবে, জাগাইছে প্রাণী সবে
হেরিতে নিশার হেন রূপ বিমোহিনী—
আজি এ সুখ বাসরে, অনুকূল বিধি মোরে,
মিলাইয়া এ নাগরে, করে প্রমোদিনী॥

যতীন রাধারাণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল, "আজ আমাদিগের কি সুখরজনী, যেন এইরূপে আজীবন

কাটাইতে পারি, জগদীশ্বরের নিকট কেবল এই ভিক্ষা চাই।" ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ঝিল্লিরা ঝিঁ ঝিঁ রবে রাত্রির ভীষণতা বর্দ্ধন করিতেছে। রাধারাণী ও যতীন উভয়ে অপরাহ্নে আহার করিয়াছিল বলিয়া রাত্রিতে আর খাইতে ইচ্ছা হইল না। মালী পূর্ব্বাহ্নে বিছানা জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, অগত্যা সেই খাটের উপর উভয়ে মনের সুখে শয়ন করিল। এইরূপে দুই তিনদিন কাটিল। চতুর্থ দিবসের রাত্রিতে উহারা উভয়ে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় বাগানের ফটকের নিকট একখানি গাড়ী থামিল, বোধ হইল, বাগানের ফটক খোলা ছিল বলিয়া গাড়ীখানির শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিশেষে তাহাদের নিকট উপস্থিত। গাড়ী হইতে রাধারাণীর মাতা 'রাণি!' 'রাণি!'বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। রাধারাণী ভয়ে জড় সড় হইয়া যতীনের বক্ষের মধ্যে লুকাইতে গেল, যতীনকে বলিল "উহাদিগকে তাড়াইয়া দাও" যতীন বলিল "কেন ভয় কিসের।" যতীন রাধারাণীকে অতি কষ্টে বক্ষ হইতে নামাইয়া বাহির হইয়া দেখিল, রাধারাণীর মাতা, ভগ্নি ও ভগ্নির বাবু উপস্থিত। যতীন উহাদিগকে সাদরে বৈঠকখানায় বসাইল। উহারা অনেক কষ্টে বাগানের সন্ধান করিয়া আসিয়াছিল। রাধারাণী অন্য কক্ষ হইতে দেখা দিল। রাধারাণীর মাতা উহাকে বলিল "হাঁরে বেটী তোর প্রাণ এতদূর পাষাণ, একটু দয়া মায়া নাই, আমি বুড় মা, দশমাস গর্ভে ধ'রেছি এমন করিয়া ভাবাতে হয়, যতীন ত ঘরের ছেলে উহার

সহিত আসিলে আমি কি তোকে মানা ক'র্ত্তুম, তুই কেন আমাকে না ব'লে চ'লে এলি? আমি তোকে কখনই বারণ কর্ত্তম না। রাধারাণী বলিল "তখন বুঝিতে পারি নাই ভয়ে করিয়াছি।" রাধারাণীর মাতা বলিল "এখন যতীনকে লইয়া বাটীতে চল, দরজায় গাড়ী আছে।" রাধারাণী বলিল "আগে আমাকে বল নিশিকান্তকে আর কখন আসিতে দেবে না? নিশিকান্তের নাম কখন মুখে আনিবে না? আগে অঙ্গীকার কর তবে যাইব, নচেৎ কখনই যাইব না। আমার মাথা ছুঁইয়া, ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া দিব্য কর।" রাধারাণীর মাতা অগত্যা তাহাই করিল। রাধারাণী বলিল "আমি অদ্য যাইবনা আগামী কল্য কার্ত্তিক পূজার দিন যাইব।" যতীন রাধারাণীর মাতা ও আর আর সকলকে যথেষ্ট আহারাদি করাইল। তাহার পর উভয়ে সান্ত্বনা বাক্যে তাহাদিগকে বিদায় দিল। রাধারাণীর মাতা এবং আর আর সকলে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ফটক হইতে বাহির হইয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল। রাধারাণী ও যতীন নির্ভয়ে পুনর্ব্বার শয়ন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

যতীন ও রাধারাণী অতিকষ্টে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাধারাণীর মাতার আর আনন্দ ধরে না। পাছে রাধারাণী আবার কোথাও চলিয়া যায়। এই আশঙ্কা করিয়া নিশিকান্তকে আর আসিতে দেয় না, যতীন বিমর্ষভাবে বাটী আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধের শরীর শীর্ণ, মন বিমর্ষ, সদাই চিন্তিত, বাটীর আর আর সকলের অবস্থা ও ঐরূপ, সকলে যেন চাঁদ হাতে পাইল, কেহ বলিতেছে একবার আমাদিগকে বলিয়া যাইতে নাই। যতীন নীরব, বৃদ্ধ বলিলেন, "ভাই আসিয়াছ? আমি এবার কাশী যাইয়া তীর্থ ধর্ম্ম করিব, আর আমার সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, বিষয় কার্য্য তোমরা দেখিয়া শুনিয়া লও, আমি আর তোমাদের জন্য ভাবিতে পারি না।" এ সমস্ত যতীনের কিছুই ভাল লাগিল না। তাহার গৃহ যেন শ্মশান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেন অশান্তির কোলে আসিয়া পড়িয়াছি, কখন রাধারাণীর নিকট যাই, যেন প্রতিক্ষণ যুগ

বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্নান করিতে গেল, স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাটীর ভিতর আহার করিতেগেল তথায় পরিবারবর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত আহার করাইতে বসাইল। যতীনের কিছুই ভাল লাগিল না, পলে পলে রাধারাণীর সহিত একত্রে আহার, একত্রে বিহার, একত্রে শয়ন এবং একত্রে কথোপকথন একএক করিয়া যতীনের হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। কেবলমাত্র আহার করিতে বসিতে হয় বসিল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল, মুখ ধুইতে গেল, এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পরিবারবর্গ সকলেই চিন্তিত। যতীনের ঠাকুর মাতা এক ডিবা পান দিয়া বলিল যতীন তোর কি হ'য়েছে? আমায় বল্ তোর এমন অবস্থা কেন হ'ল? তুই ছেলেবেলায় বাপ মা সব হারিয়েছিস্, এমন যে সোনার নাতবউ সেও হারিয়েছিস্, আমায় খুলে বল্ আমি আবার তোর বিয়ে দিয়ে সংসার ক'রে দি। তুই তো একেবারে বিয়ে কো'র্ত্তে নারাজ, কর্ত্তা বিধি-মতে চেষ্টা ক'রেছেন কিছুতেই তোর মত হ'ল না। আমাকে বল্‌বিনিত কাকে বল্‌বি? তোর মা, কেবল প্রসব ক'রেছে মাত্র, আমিই তোকে কোলে পিটে ক'রে এতবড় ক'রেছি। আমার নিকট সব খুলে বল্ তোর কি হয়েছে? আমি ইহার বিহিত ক'র্ব্বো।" যতীন মৌখিক হাসিল এবং বলিল, "আমি বিদেশ হ'তে আস্‌ছি সমস্ত দিন কলের গাড়ীর কষ্ট, না খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, এই সমুদয়ে কষ্ট হইয়াছে আর কিছুই নহে" বলিয়া বাহিরে

চলিয়া গেল। যতীন বাহিরে আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ দাদামহাশয় বাহিরে বসিয়া আছেন। কি বলিয়া বাটীর বাহির হ'বে, এই ভাবনায় কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া, পরিশেষে সামনে দিয়া গুটী গুটী করিয়া, যাইতে লাগিল। এমন সময় দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতীন! আবার কোথায় যাইতেছ? শরীরে এত কষ্ট হইয়াছে; বলি, আজ না হয়, বাড়ী থেকে নাই বেরুলে।" যতীন বলিল, "একবার ডাক্তারের কাছে যাইতেছি।" যতীন মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের নিকট যাইয়া বসিত; ডাক্তারও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বৃদ্ধ তাহা জানিতেন সুতরাং আর কিছুই বলিলেন না। যতীনও বাড়ীর বাহির হইল। কিছুক্ষণ পরে যতীন রাধারাণীর বাটী আসিয়া উপস্থিত। সে রাত্রি আর বাটী ফিরিল না। বৃদ্ধ কর্ত্তা চুণিকে ডাকাইলেন। চুণি আবার সন্ধান লইল; দেখিল, মূর্ত্তিমান্ সেথায়। চুণি যতীনকে নানা রকম বুঝাইল, যতীন কিছুতেই বুঝ মানিল না। চুণি তখন দেখিল, রোগ সাংঘাতিক, সহজে বাগ মানিবার নয়। অগত্যা চুণি ফিরিয়া আসিয়া যতীনের দাদামহাশয়ের নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিল। বৃদ্ধ স্তম্ভিত,—কিছুক্ষণ গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিলেন। যতীনের ক'দিন অনুপস্থিতির কারণ আর অবিদিত রহিল না। চুণি চলিয়া গেলে, বৃদ্ধ ভাবিল—ইহার উপায় আর কিছুই নাই; লেখা পড়া শিখিয়াছে, অবুঝ নয়; উহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুক,; এ স্রোত ফিরাইবার নয়। বাটীতে সকলেই প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইল। যতীন

মধ্যে মধ্যে কখন বাটী আসিত, কখন আসিত না ; কিন্তু কেহই কিছুই বলে না, যখন যাহা দরকার লইয়া যায় ; সময়ে সময়ে ঠাকুরমা যতীনকে ঠাট্টা করিয়া বলেন,—"কেমন নাত-বউ করেছিস্, আমাদিগকে দেখাবিনি ?" যতীনের এ সব কথা বিষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুরমাকে ভয় দেখাইয়া বলিত যে, এরূপ ঠাট্টা করিলে আমি আর বাড়ী আসিব না। এরূপ বিকৃত অবস্থা দেখিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল। রাধারাণী অত্যন্ত ভালবাসা দেখাইতে লাগিল ; যতীন রাধারাণী ভিন্ন জানে না, রাধারাণীও যতীন ভিন্ন জানে না ; যে দেখে, সেই বলে, আহা ইহাদের কি ভালবাসা ! ভাল খাওয়াইবে, ভাল পরাইবে, এই লইয়া ব্যস্ত ! যতীনের যাহা কিছু ছিল, সব ফুরাইল ; ক্রমে পয়সার অভাব হইতে লাগিল। আর সামান্য পয়সায় চলে না : রাধা-রাণী সদাই বারণ করে,—"যতীন ! তুমি কেন এত পয়সা খরচ কর্‌ছ ?" এদিকে বৃদ্ধের নিকট অন্য লোক দিয়া টাকার জন্য পীড়াপীড়ী করিত। দাদামহাশয় দেখিলেন, যতীনের যেরূপ অবস্থা, আত্মঘাতী হইতে পারে, এই ভয়ে কিছু কিছু টাকা দিতে লাগিলেন ; এইরূপে দুই তিন মাস কাটিল।

লোক-মুখে চন্দ্রশেখরের দৃশ্যপট অতি সুন্দর হইয়াছে শুনিয়া, যতীন রাধারাণীর অনুমতি চাহিল। রাধারাণী বলিল,— "আমি তোমাকে একলা যেতে দে'ব না ; আমিও সঙ্গে যা'ব।" যতীন বলিল,—"শোনা যায় যে, এখন অনেক লোকের ভিড় হ'চ্ছে। উভয়ের অত্যন্ত কষ্ট হ'বে ; সেজন্য তোমাকে

আজ নিয়ে যেতে পার্‌ব না; আর একদিন ল'য়ে যাব।" রাধারাণী কিঞ্চিৎ দুঃখিতা হইল। কিন্তু কি করে, যতীনের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া যাইতে বাধা না দিয়া অনুমতি দিল। যতীন সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। থিয়েটার হইতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি অবসান হইল।

এদিকে নিশিকান্ত দেখিল, রাধারাণীকে পাইবার আর তাহার কোন আশা নাই। কারণ যতীনের অবস্থা ভাল; ইহাকে তাড়াইবার কোন উপায়ই নাই। পরস্পরের যেরূপ ভালবাসা, টাকাতে কিছুই আটক থাইবে না। যতীনকে কোন রকমে গুরুতর আঘাত করিয়া গৃহে শয্যাগত না করিলে, আর কোন উপায় নাই। এইরূপ দুশ্চিন্তায় স্বকার্য্য সাধিবার কল্পনা মনে স্থির করিয়া,ঈর্ষাপরবশ হইয়া,তিন চারিজন বদমায়েস লোক লইয়া দুই তিন মাস ধরিয়া সুবিধা খুঁজিতেছিল। কোন দিন রাস্তায় পায় না। আজ যেমন থিয়েটারের অভিনয় সাঙ্গ হইবার পর রাধারাণীর বাটীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি নিশিকান্ত ঐ বদমায়েস লোক দ্বারা যতীনকে আক্রমণ করিল। প্রথমে যতীনের মস্তকে একটী লাঠি পড়িল; যতীন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল;—"আমায় খুন ক'ল্লে—কে কোথায় আছ, আসিয়া সাহায্য কর।" পরক্ষণেই আবার একটী লাঠি ঘাড়ে পড়িল; অমনি যতীন "বাপ্‌রে" বলিয়া ভূতলশায়ী হইয়া গোঁঙরাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থা দেখিয়া, উহারা পলাইবার চেষ্টা করিল; নিশিকান্ত নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে "ছোরা মার" "ছোরা মার" বলিয়া উঠিল।

উহারাও অমনি তাহার কথামত যতীনের পৃষ্ঠে ছোরা বসাইয়া পলায়ন করিল। পথে এই চীৎকার ও গোমরানি শব্দ বৃদ্ধি পাইল। রাধারাণী তাহা শুনিতে পাইয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আলুলায়িতকেশে উন্মাদিনীর ন্যায় একটী আলো হস্তে ছুটিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইল। সম্মুখে দেখিল, যতীন রক্তাক্তকলেবর—চারিদিকে রক্তের স্রোত বহিতেছে! রাধারাণী এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল;—"যতীন" "যতীন" বলিয়া চীৎকার করিয়া, উহার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এদিকে ঐরূপ বিপজ্জনক চীৎকারে রাধা-রাণীর এবং পার্শ্বস্থ বাটীর লোক সকল আসিয়া উপস্থিত হইল; দুইজন পাহারাওয়ালা একটু দূরে ছিল; যতীনের চীৎকার শুনিয়া ও ঐ লোকদিগকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়া, দুইজনকে দুইটী পাহারাওয়ালা গ্রেপ্তার করিল; কিন্তু নিশিকান্ত বাগানের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল। পাহারাওয়ালাদ্বয় ঐ দুইটী বদমায়েস লোককে ধরিয়া, যেখানে যতীন রক্তাক্তকলেবরে পতিত রহিয়াছে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইল।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া, উহারা একখানি গাড়ী ডাকাইল। এদিকে ক্রমে রাধারাণীর সংজ্ঞালাভ হইল। সকলেই যতীনের মাথায় জল দিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল; গায়ের রক্ত জল দিয়া ধুইয়া দিল; কিন্তু রক্ত থামিল না! গল্‌গল করিয়া রক্ত বেগে অনবরত বহিতে লাগিল। সকলেই ভয়ে জড় সড় হইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। গাড়ী জোড়াবাগান

থানায় চলিল। এদিকে রাধারাণী আর একখানি গাড়ী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতীন ঐরূপ অবস্থায় থানায় আসিয়া উপস্থিত। ইনস্পেক্টর সাহেবের সহিত যতীনের সবিশেষ সৌহৃদ্য ছিল বলিয়া, উহাকে আর হাঁসপাতালে যাইতে হইল না। ইনস্পেক্টর সাহেব সমস্ত রিপোর্ট লিখিয়া লইলেন। পরে ঐ ছ'জন বদমায়েস লোকের হাতে হাতকড়ি দিয়া অন্য গৃহে রাখিতে হুকুম দিলেন। যতীনও এদিকে রাধারাণীর সহিত একত্রে নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধারাণী কোন মতে বাটী যাইতে চাহিল না। যতীন অনেক করিয়া বুঝাইয়া রাধারাণীকে বিদায় দিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

যতীন নফরকে ডাকাইল। নফর আসিয়া, বাবুর অবস্থা দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া, কর্ত্তাবাবুকে সংবাদ দিল, "বাবুকে কে খুন করিয়াছে, একবার আসিয়া দেখুন!" বৃদ্ধ চমকাইয়া 'আঁ্যা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; তাড়াতাড়ি আসিতে পড়িয়া গেলেন; উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যতীনের গৃহে আসিলেন;—দেখিলেন সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বহিতেছে, যতীন কথা কহিতে পারিতেছে না। বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল; শোকসম্বরণ করিতে না পারিয়া, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আমার কি সর্ব্বনাশ হইল।" এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া, কি অজ্ঞাত অসম্ভাবিত সর্ব্বনাশ হইল বুঝিতে

না পারিয়া, পরিজনবর্গ যে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ছুটিয়া যতীনের বাহিরের ঘরে আসিল। সকলেই তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য; প্রতিবেশীরাও আসিয়া উপস্থিত হইল! কেহ ডাক্তার আনিতে গেল, কেহ যতীনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, কেহ বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কেহ বা সহানুভূতি দেখাইয়া দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল! পরিবারবর্গ সকলেই ক্রন্দন করিতেছে; এমন সময় যতীনের প্রিয় ডাক্তার মন্মথবাবু আসিয়া উপস্থিত; দেখিলেন চারি ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত্ত হইয়াছে, রক্ত আসিতেছে না অমনি ডাক্তার রক্ত আনাইবার জন্য Tincture Ferri Muriate (টিংচার ফেরি মিউরিএট্) প্রেসক্রাইব করিলেন, ঘাড়ে ব্যাথার জন্য আরনিকা লোসেন দিলেন, ক্ষত স্থানের জন্য একজন 'ড্রেসার' নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং খাইবারও একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার যাইবার সময় সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদিগের যতীনের কোন ভয় নাই ত? আপনি যদি ইংরাজ ডাক্তার আনিতে বলেন তাহাতেও আমরা সম্মত আছি।" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমাদ্বারাই সকল কার্য্য হইবে; কোন ভয় নাই! রক্তটা বন্ধ হইলে, দুই চারি দিনের মধ্যে আরাম হইবে।" এই-রূপ আশ্বাস দিয়া, ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। যতীনের ঠাকুরমা কালীর পূজা মানিতে লাগিলেন—আমার যতীন আরাম হইলে, যোড়শোপচারে জোড়া পাঁটা এবং বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া পূজা দিব। বাড়ীর পরিজনেরা নিজ নিজ গৃহকার্য্যে

চলিয়া গেল। কেবল যতীনের দাদামহাশয় এবং অন্য দুই একজন প্রতিবেশী নিকটে রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাধারাণী যতীনকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া, বড় কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী করিয়া বাটী পৌঁছিল। তখন বেশ ফরসা হইয়াছে; পথে ঘাটে লোকজন চলিতেছে; বাটী আসিয়া, একেবারে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিল। রাধারাণীর মাতা তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না; মনে করিল—যতীনের কিছু কি ভাল মন্দ হইয়াছে? আহা, বাছার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রাণ সংশয়! রাধারাণীর দিকে দেখিল, রাধারাণী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে। রাধারাণীর পার্শ্বে বসিয়া, মুখের চুলগুলি তুলিয়া দিল, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিল,—"মা! অমন করিয়া, কাঁদিলে কি হবে? উহাতে যতীনের অকল্যাণ হয়; যতীনের কিছু অমঙ্গল হয় নাই? আমায়

ভেঙ্গে বল্।" রাধারাণী আরো সজোরে ফুঁপাইতে লাগিল; বাটীর অন্যান্য লোক আসিয়া রাধারাণীকে উঠাইল এবং বলিল "উঠিয়া স্নান কর, কিছু আহার কর।"—রাধারাণী প্রবোধ মানিল না, অঝোরে কাঁদিতে লাগিল; সকলে জিজ্ঞাসা করিল—"অমন করিয়া কেবল কাঁদিতেছ কেন? কি হ'য়েছে আমাদের খুলে বল্!" রাধারাণী হৃদয়ের শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যতীন—বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল;" আবার বলিল "যতীন—আমার যতীন বুঝি, নাই। তাহার যে অবস্থা দেখিলাম—রক্ত ঝুঁজিয়া পড়িতেছে; শরীরে বল নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই;" অতি ক্ষীণস্বরে আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি ভগবান এ যাত্রায় আমায় রক্ষা করেন, তবেই আবার দেখা হবে; নচেৎ এই শেষ!" রাধারাণী আর বলিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "সেই স্বর আমার হৃদয়ে শেল সম বাজিতেছে। আহা! আমার যতীন এ অভাগিনীর জন্য কত যাতনা ভোগ করিতেছে: আমিই ইহার মূল, ভগবান আমার প্রতি কেন এ আঘাত দিলেন না, আমার যদি ঐরূপ অবস্থা হইত সে আমার সুখের হইত; যতীনকে দেখিতে দেখিতে হাসি মুখে ইহজন্মের মত উহার চরণে বিদায় লইতাম।" সকলেই বুঝাইতে লাগিল যে, ঐরূপ আঘাতে লোক মরে না, ইহা অপেক্ষা কত অধিক আঘাত পাইয়াছে তাহাতেও লোক মরে না, আমরা এখনি যতীনের সংবাদ আনাইয়া দিতেছি; সকলে ধরাধরি করিয়া রাধারাণীকে

স্নান করাইয়া দিল। রাধারাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় শিথিল হইয়া গিয়াছে, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অপরের দ্বারা চালিত হইতেছে; রাধারাণীকে স্নান করাইয়া আহার করাইতে বসাইল; রাধারাণী কেবল ভাতের কাছে বসিল মাত্র, কিন্তু এক গ্রাসও গলাধঃ করে নাই। বাটীর সকলেই ভাবিল, উপায় কি? যতীনের যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, রাধারাণীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি উহাকে বাঁচান দুষ্কর।"

ভোজন সাঙ্গ করিয়া রাধারাণী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রহিল। ক্রমে যত বেলা যাইতে লাগিল, রাধারাণীর প্রাণ ততই কাঁদিতে লাগিল। কোন খবর পাইতেছে না, কে খবর আনিয়া দিবে? চাকরকে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু যতীন বাটীর উপরের ঘরে ছিল বলিয়া সে সঠিক খবর আনিতে পারে নাই। এ সংবাদে রাধারাণীর মনতৃপ্তি হইল না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। রাধারাণী আর থাকিতে না পারিয়া মাধবকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিয়া পুরুষ-বেশে দেখা হইতে পারে ভাবিয়া পুরুষের মত বেশ করিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "যদি সেখানে আমাকে কেহ অপমান করে।" আবার ভাবিল, "আমার আবার মান অপমান কি? যদি যতীনের জন্য অপমানিত হই সেও আমার পক্ষে ভাল, তবুও মনকে প্রবোধ দিতে পারিব যে চেষ্টা করিয়াছি, অভাগিনীর ভাগ্যে দেখা ঘটিল না। প্রাণে বেশ জোর হইতেছে যে, যতীনের দেখা পাইব, কেহই বাধা দিতে পারিবে না।" মাধবকে

সঙ্গে লইয়া যতীনের বাটী গেল। দরজায় চুণির সহিত রাধারাণীর প্রথম দেখা হইল। চুণি রাধারাণীকে চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া রাধারাণীকে অনেক প্রবোধ বাক্যে ফিরাইয়া দিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিল কিন্তু রাধারাণী ফিরিল না ; অগত্যা চুণি যতীনকে এই সংবাদ দিল।

যতীনের প্রাণে যেন বল আসিয়া উপস্থিত হইল, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল এবং চুণিকে চুপি চুপি বলিল "শীঘ্র লইয়া আইস, আর বিলম্ব করিও না। বাটীর পরিবারবর্গকে সরিয়া যাইতে বল যে যতীনের কোন বন্ধু উহাকে দেখিতে আসিতেছে।" উহারা চলিয়া গেল। চুণি রাধারাণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া যতীনের উপরের ঘরে লইয়া গেল। যতীনের অদ্য দুপুরবেলা যেরূপ জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে রাধারাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সে জ্বর কোথায় পলাইয়া গেল। দেহ সুস্থ, শরীর ও মন সতেজ, যতীনের আঘাত ও জ্বর সে সব আর কিছুই মনে নাই, প্রাণ ভরিয়া রাধারাণীর নববেশের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। যতীন নিজের বাটীতে যে আছে ভুলিয়া গিয়াছে, "রাণী" বলিয়া সম্বোধন করিল, কিন্তু সহসা কোথায় আছি মনে পড়ায় সামলাইয়া লইল, আর কিছুই বলিল না। চুণি রাধারাণীকে "রাণুবাবু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। রাণু বাবু যতীনের একজন বন্ধু ছিল, বাটীর সকলেই মনে করিল যে সেই রাণুবাবুই যতীনকে দেখিতে আসিযাছে। স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতই অভ্যাস যে কোন অপর পুরুষ

বাটীতে আসিলে লুক্কায়িতভাবে আশ পাশ হইতে চুপি চুপি দেখে। রাণুবাবু আসাতে উহারা চুপি চুপি দেখিতে লাগিল। রাধারাণীর মুখে কথা নাই, যতীনের পদ প্রান্তে বসিয়া চরণ সেবা করিতে করিতে অজস্র কাঁদিতে লাগিল। যতীন চুপি চুপি বলিল "রাণি" ! কোথায় আসিয়াছ মনে আছে? ছিঃ! চুপ কর, আমিত ভাল আছি, আমারত কিছুই হয় নাই, যাহা আঘাত লাগিয়াছে উহা দুই তিন দিনের মধ্যে সারিয়া যাইবে। আবার তোমাকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে আমোদ করিব।" রাধারাণী বলিল, "আমার মনে বড় দুঃখ রহিল যে, এ সময় তোমার নিকট সদা সর্ব্বদা থাকিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না। তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ, আমার জন্য তোমার সোনার অঙ্গ কালিমাখা করিয়াছ, আমার জন্য তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, শেষ প্রাণ, তাহাও তোমার যাইতে বসিয়াছে, আমি মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব? যদি ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্র আরাম হইয়া উঠ তবেই আমার মন প্রবোধ মানিবে, নচেৎ চির-দিনই মনে জ্বলিবে যে আমিই ইহার মূল; এই যে অশ্রু-ধারা বহিতেছে আজীবন বহিবে, কখনই বিশ্রান্ত হইবে না।"

যতীন বলিল "তুমি মিছামিছি কেন এরূপ অমূলক চিন্তা করিতেছ? আজ তোমাকে দেখিয়া রোগের যাতনা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, ক্ষত স্থানের বেদনা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তোমার দর্শনে অমোঘ মহৌষধি লাভ করিয়াছি, ইহার ফল কখনই ব্যর্থ হইবে না। কাল আসিয়া আমাকে

দেখিবে যে আমি একেবারে রোগমুক্ত হইয়াছি"। এক্ষণে পদপ্রান্ত হইতে যতীন আপনার পার্শ্বে বসাইল। যতীনের প্রাণ চাহিল যে যদি এ জীবনে আর না দেখিতে পাই, ইহজন্মের মত বক্ষে লইয়া এ তাপিত প্রাণ শীতল করি, প্রাণ চাহিল—পারিল না, ভাবিল "বাটীর কে কোথা হইতে দেখিতে পাইবে।" রাধারাণীর প্রাণেও ঐরূপ হইল; পরস্পরের প্রাণ অবিদিত রহিল না। তখন যতীন চুণিকে বলিল "ভাই, একবার উঠিয়া দেখ, ঘরের আসে পাশে কেহ আছে কিনা।" চুণি উঠিয়া দেখিল, কেহই নাই তখন সস্নেহে রাধারাণীকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রাধারাণীর বক্ষ স্ফীত, শরীর রোমাঞ্চিত, চকিতে পরস্পর পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়া রাধারাণীকে অতি কষ্টে বিদায় দিল। রাণুবাবু এইরূপে যতীনের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিল, যতীন ও রাণুবাবুকে দেখিতে পাইয়া শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিল।

ক্রমে মোকদ্দমার দিন আসিয়া উপস্থিত। যতীনের পীড়ার জন্য মোকদ্দমা স্থগিত ছিল, এক্ষণে যতীন আরাম হইয়া মোকদ্দমা চালাইল। যতীনের পিতামহ বড় বড় কৌন্সিলি দিয়া এই মোকদ্দমায় যাহাতে উহাদিগের জেল হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রতিবাদী পক্ষও বড় বড় উকীল দিয়াছিল। উভয় পক্ষেরই কেবল অর্থ শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। যতীনের টাকা উহার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব খাইযাছিল, অনেকদিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিয়াছিল। পরে ফল দাঁড়াইল যে ঐ বদমায়েস দুজনের একশত টাকা

করিয়া অর্থদণ্ড, না দিতে পারিলে তিন মাস করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা। নিশিকান্তের দোষ সপ্রমাণিত না হওয়ায় একখানি মোচ্‌লেখা লিখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যতীন নিশিকান্তকে জেলে দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া পূর্ব্বের দুই তিন মাস যে জেল খাটিয়াছিল উহার কাগজ পত্র আনাইতে কিছুই ত্রুটী করে নাই। কিন্তু সাক্ষীর জবানবন্দীতে এবং উহার এক বন্ধু উকীলের বিশ্বাসঘাতকতায় দোষ সাব্যস্ত হইল না।

যতীন এক্ষণে নির্ভয়ে রাধারাণীর বাটীতে সময়ে অসময়ে যাতায়াত করিতে লাগিল। নিশিকান্ত খালাস পাওযায় রাধারাণীর মাতায় প্রাণে অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মো কদ্দমায় প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল, যতীন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। টাকার অসচ্ছল, নিজের এমন কোন উপায় নাই যে সুচারুরূপে ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। রাধারাণী যতীনের অবস্থা জানিত যে যতীন এক্ষণে পরাধীন, নিজে রোজগারী নয়। এজন্য পূর্ব্বেই যতীনকে বলিত যে এত খরচ করিও না; যতীন শুনিত না। এখন রাধারাণী পরামর্শ দিতে লাগিল "তুমি যাহা পার দিও এবং আমি নিজে যে প্রকারে পারি নিজের খরচ চালাইব। যতীন তুমি এটা মনে করিও না যে অন্য কাহাকে আবার হৃদয়ে স্থান দিব।" রাধারাণীর ছোট ভগ্নী কোন থিয়েটারে কর্ম্ম করিত। থিয়েটারের অধ্যক্ষ মহাশয় রাধারাণীকে লইতে নিতান্ত ইচ্ছুক, এক্ষণে রাধারাণী যতীনকে বুঝাইয়া কোন থিয়েটারে ৩০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল। থিয়েটারের অধ্যক্ষমহাশয়

যতীনকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং ভালবাসিতেন, যতীনের খাতিরে উহাকে একেবারে ৩০৲ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কোন অংশ অভিনয় করিতে হইত না; কেবল থিয়েটারের অধ্যক্ষ মহাশয় উহাকে সঙ্গে করিয়া কে কি প্রকারে অভিনয় করিতেছে তাহা চতুর্দ্দিকে দেখাইয়া বেড়াইতেন। অধ্যক্ষ মহাশয় কোনদিন রাধারাণীকে বলিলেন "আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া এরূপ বেড়াই এই কথা যতীন শুনিলে বোধ হয় তোমাকে আর থিয়েটার করিতে দিবে না।" ইহাতে রাধারাণী বলিল· "যতীনের আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেজন্য থিয়েটারে দিয়াছে, নচেৎ কখনই দিত না, আমি নিজেও উহাকে বলিয়াছি যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার কোন ভয় নাই, আমি থিয়েটারের যদি কাহাকে হৃদয়ে স্থান দি তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" যতীনেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রাধারাণী কখনই বিশ্বাসঘাতিনী হইবে না। রাধারাণী প্রাণপণে থিয়েটারের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়াদি শিক্ষা করিতে লাগিল। এরূপে সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রাধারাণী কোন অংশ লইয়া নিজে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহাকে দেখিয়া কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী যুবক বাটীতে লোক পাঠাইতে লাগিল; রাধারাণীর মন কিছুতেই টলিল না। অর্থ-প্রলোভন তাহাকে কিছুই করিতে পারিল না। যতীনেরই রাধারাণী রহিল।

যতীনের উপর দিয়া তিন চারি মাস ধরিয়া এইরূপ কতই প্রতিকূল স্রোত বহিয়া গেল। পরে একদিন রাধারাণী থিয়েটার হইতে আসিয়া যতীনকে বলিল "দেখ পুরাতন পুস্তকের নাচ গান না শিখ্‌লে আমি উন্নতি ক'র্‌তে পার্‌'ব না, কবে নূতন পুস্তক হবে, তবে তার নাচ গান শিখ্‌ব এরূপ ক'র্‌তে গেলে আমার চ'ল্‌বে না, কোনও অভিনেত্রীরই চলে না, শিক্ষাও হয় না, উন্নতিরও আশা নাই। আমাদিগের থিয়েটারে শিবেনবাবু হারমোনিয়ম বাজায়, তোমার সঙ্গেও উহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব আছে, আমার বোধ হয় তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলে সম্ভবতঃ তিনি এখানে আসিয়া আমাকে পুরাতন পুস্তকের নাচ গান শিখাইতে পারেন। শিবেন বাবুকে তুমি একবার অনুরোধ কর, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" ইহা শুনিয়া যতীন স্বীকৃত হইল এবং শিবেনকে তাহার পর দিবস একেবারে সঙ্গে করিয়া রাণীর বাটীতে উপস্থিত হইল। রাণী ও যতীন শিবেনকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মূহুর্মূহু ভাল তামাকু এবং মুটো মুটো পান ছাড়িতে লাগিল; যাইবার সময় বিশেষরূপে আহার করাইয়া ছাড়িয়া দিল। যতীন বলিল "দেখ ভাই শিবেন! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু তোমার হাতে আমার প্রাণের রাণীকে সমর্পণ করিলাম, ইহার যাহাতে উন্নতি হয় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে, অধিক আর তোমায় কি বলিব।" শিবেনও আপ্যায়িত করিয়া বলিল "সেকি ভাই! আমাকে কেন অত করিয়া বলিতেছ,

তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ আছে? আমি তোমার উপর কত জোর করিয়াছি, কত খাওয়াইয়াছ, তোমারও আমার উপর সেইরূপ জোর আছে, তোমার এরূপ বলা আমাকে কেবল লজ্জা দেওয়া মাত্র।" শিবেনবাবু পূর্ব্ব-বঙ্গের বিখ্যাত জমীদারবংশসম্ভূত, কিন্তু এখন একেবারে অবস্থা হীন হইয়া গিয়াছে, জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্যামবর্ণ, শীর্ণকায়, চুলগুলি বাবরী-কাটা, প্রায় সামে সিঁতে কাটে, বেলদার পাঞ্জাবী-আস্তেন জামা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে থিয়েটারে কেবল গানের সহিত সঙ্গত করিত, পরে ক্রমশঃ পদোন্নতি হওয়ায় হারমোনিয়ম বাজাইতে লাগিল। ইহার বয়স প্রায় ৩০।৩২ বৎসর, দেখিলে উহার বয়স অত বেশী বলিয়া বোধ হয় না, মোটের উপর দেখিতে ফিট্‌ফাট্, বেশ্যা মজলিসে একজন ইয়ার লোক।

শিবেনের প্রত্যহ যাওয়া আসা চলিতে লাগিল, ক্রমে ঘনীভূত হইয়া পড়িল। রাধারাণীকে শিবেন অতি যত্ন করিয়া নাচ গান শিখাইতে লাগিল। এই দেখিয়া যতীন শিবেনকে আপনার মুখের খাবার দিয়া উহাকে খাওয়াইত। যতীনের যতদূর সাধ্য মাহিনা বলিয়া নহে, মাহিনার উপর খরচ পড়িত, এমন কি একঘরে তিনজনে রাত্রিও কাটাইতে লাগিল। রাধারাণীও শিবেনকে প্রাণের সহিত যত্ন করিতে লাগিল, এমন কি দিনরাত শিবেন ঐ বাটীতে থাকিত এবং স্নান আহার করিত। ইহাতে রাধারাণীর সুবিধা হইতে লাগিল।

এইরূপে তিন চারি মাস চলিতেছে, একদিন দেবেন্দ্রবাবু দুই একটী মোসাহেব সঙ্গে করিয়া রাধারাণীর বাটীতে উপস্থিত হইল। যতীনকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন "একদিন আমাদিগের "বঙ্গেশ্বর পতন" এবং "নচ্ছার বাজার" অভিনয় হইবে। তাহাতে আপনার রাণীকে অভিনয় করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" যতীন বলিল "ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনি যেদিন বলিবেন সেই দিবসই যাইবে।" দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন "অভিনয়ের পূর্ব্বে আমার বাগানে দুই তিন দিন যাইয়া রিহার্সেল দিতে হইবে। ঐ স্থানে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ উপস্থিত থাকিবে। যতীন তাহাতেও কোন আপত্তি করিল না। যতীন জিজ্ঞাসা করিল "কবে হইতে যাইতে হইবে?" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন 'পরশু' এবং যতীনকে বিশেষ করিয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন "আপনাকে যাইয়া সমুদয় তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।" যতীন ইহাতে সম্মত হইল। তখন উভয়ের মধ্যে রঙ্গরস চলিতে লাগিল, নানাপ্রকার কথোপকথনও হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র-বাবুর প্রধান মোসাহেব টেঁপা। উহার বেশ্যামহলে খুব পসার, কারণ যত্ন আয়ত্তি করিতে বেশ জানে। সে কোন একটী থিয়েটারের অভিনেত্রীর মন মজাইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও পরিশেষে পরলোকগামিনী করিয়া উহার সমুদয় ঘরের আসবাব এবং গহনা পর্য্যন্তও নিজের গৃহসাৎ করিয়াছিল; এমন কি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার খরচ পর্য্যন্তও ছিল না! সুতরাং টেঁপা বেশ্যাদিগের ভালবাসার গুণসম্পন্ন লোক—আকার

খর্ব্ব, দেহ শীর্ণ, গৌরবর্ণ, মুখখানি বুলডগের ন্যায়, বেশভূষা বেশ পরিপাটী, এমন কি দেবেন্দ্রবাবু অপেক্ষাও উত্তম। দেবেন্দ্রবাবুর ভাল কাপড়, জামা, ঘড়ি, আংটী, চেন লইয়া সাজিত। দেখিলে বোধ হইত যেন ইনি স্বয়ংই দেবেন্দ্র বাবু। বাকচাতুর্য্যে বিশেষ পটুতা ছিল, দোষের মধ্যে একটু হাতটানও ছিল। দেবেন্দ্র বাবুর টাকা কড়ি উহার নিকট জমা থাকিত; কিন্তু হিসাব চাহিলেই গোলমাল বাধিত, প্রায়ই টাকা হইতে দশ বিশ টাকা কম হইত। উহাকে যে দেখিত সে বলিত যে এইটী দেবেন্দ্র বাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য। টেঁপা অতিশয় স্বার্থপর, যথায় কিছু স্বার্থ থাকে তথায় মান অপমান কিছুই জ্ঞান করিত না। এজন্য অনেক স্থানে অপমানিতও হইয়াছিল। মোটের উপর টেঁপা একটী ভদ্র-বংশজাত কুলাঙ্গার, জঘন্য যোগানদার—পেশাদার নহে—সখের।

দেবেন্দ্রবাবু যতীনের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রবাবুর বাগানে যাইবার দিন আসিল; যতীন ও শিবেন রাণীকে সঙ্গে করিয়া দেবেন্দ্রবাবুর বাগানে গেল। উহারা উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রবাবু যথোচিত সমাদর করিলেন। ঘরে গিয়া দেখেন, আসর খুব সরগরম। সে স্থানে ননীবাবু, মণীবাবু, অখিলবাবু, ভূষণমোহনবাবু, গদাবাবু, ইত্যাদি বাবুর হাট বসিয়া গিয়াছে; অভিনেত্রীর মধ্যে বিধু, হরি, বসন্ত, হাঁধা, গুলি—ইহারা সকলে গান গাহিতেছিল। দেবেন্দ্রবাবু রাধারাণীকে গান গাহিবার জন্য

অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, অগত্যা রাধারাণী উহাদিগের সহিত যোগ দিল। শিবেন হারমোনিয়ম ধরিল, টেঁপা সঙ্গত করিতে লাগিল। শিশিরবাবুও মধ্যে মধ্যে যাইয়া উহাদিগকে দেখাইয়া শুনাইয়া দিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবু সকলকে যথেষ্ট চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আহার করাইয়া দিয়া অধিক রাত্রিতে গাড়ী করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন, কেবল হারা ও দেবেন্দ্রবাবু বাগানে রহিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে যাতায়াত চলিতে লাগিল। ক্রমে যতীনের সহিত দেবেন্দ্রের গাঢ় প্রণয় জন্মিল, যতীন প্রায়ই দেবেন্দ্রের বাগানে যাইতে লাগিল। এই সময় দেবেন্দ্র একদিন যতীনের নিকট একখানি পত্রিকা বাহির করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে এবং যতীনকে পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। যতীন সম্মত হইল এবং যত্নের সহিত উহার কার্য্য করিতে লাগিল। পত্রিকা-খানিও বিশেষ সুবন্দোবস্তে এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবুও যতীনের সময়ে সময়ে অনেক উপকার করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রবাবু স্বীয় গৃহলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া হারা নামে একটী অভিনেত্রীর প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন। হারাও সর্ব্বস্ব অর্থাৎ মা ভগ্নী এবং নিজের অলঙ্কারাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়া, দেবেন্দ্র-বাবুকে লইয়া উন্মত্তা হইয়া ঐ বাগানেই বাস করিতে লাগিল। উহারা উভয়ে যতীনকে প্রাণের সহিত যত্ন করিতেন। যতীনও সেইরূপ উভয়কে দেখিত। যতীন এইরূপ কাজে

ব্যস্ত থাকায় রাধারাণীর বাটীতে সর্ব্বদা থাকিতে পারিত না, কোন দিন বা রাধারাণীর নিকট আসিতও না, দিনের বেলা থাকা প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না।

রাধারাণীর প্রতি যতীনের ভালবাসা কিন্তু সেইরূপই আছে, কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শিবেনের আসা যাওয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, থিয়েটারের অভিনেত্রীরা রাধারাণীকে বীজ-মন্ত্র দিতে লাগিল, "কেন ঐরূপ ভাবে যতীনকে লইয়া আছিস্, এই বেলা ছুখানা গহনা ক'রে নে, এর পর আর কবে ক'র্‌বি, যতীনকে লইয়া থাক্ তাহাতে বারণ করি না, কিন্তু এত বড় বড় লোক তোর বাটীতে লোক পাঠায়, তুইত তাহাদের আমলই দিস্ না। আমরাও ত ভালবাসি—কিন্তু উহার ভিতর হইতে গহনা ও বাড়ী করিয়া লইতেছি। ছুইখানা গহনা এবং বাড়ী থাক্‌লে এর পর কত কাজ দেখ্‌বে, যতীনকে বসিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে খা'না।" রাধারাণী বাটী আসিল—পদ্মপত্রের ন্যায় মন টলিতে লাগিল। একবার ভাবিল, এ কাজ করিব না; আবার ভাবিল, ইহাতে যতীনের কিছুই ক্ষতি হইবেনা বরং উহাকে লইয়া আজীবন কাটাইতে পারিব। শিবেনকে হাতে রাখিবার জন্য উহাকে সমুদয় কথা বলিল। শিবেনও উহাতে যোগ দিল ও কহিল "আমি থাকিতে কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিবে না।" রাধারাণী এখন শিবেনের হাতে আসিল। তাহার মন ঐ দিকে একটু নরম হইল। শিবেনও অবসর পাইয়া কিরূপে রাধারাণীকে হস্তগত

করিতে পারিবে এইরূপ সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শিবেনও টেঁপার শ্রেণীভুক্ত; টেঁপা যেরূপ বেশ্যাদিগকে যত্ন করিত, শিবেনও সেইরূপ যত্ন দ্বারা অনেক বেশ্যার মন হরণ করিয়াছে। শিবেন যতীনের নামে ভাংচি দিতে লাগিল। এদিকে দেবেন্দ্রবাবু ও হারা যতীনকে এরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন যে, যতীন একদিন না আসিলে দেবেন্দ্রবাবু নিজে আসিয়া উহাকে লইয়া যাইতেন। উভয়ে আত্মপর ভেদ ছিল না। দেবেন্দ্রবাবু মোসাহেব সমেত বিজয়ার দিন আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া গেলেন। এইরূপে যতীনের বাগানে যাতায়াত চলিতে লাগিল। যতীন রাধারাণীকে একদিনের জন্যও মনে অবিশ্বাস করিত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন পরে রাধারাণীর অসুখ হইল। পত্রিকা প্রকাশের ঝঞ্ঝাটে যতীন দিবাভাগে রাধারাণীকে দেখিতে আসিতে পারিতনা বলিয়া শিবেনের উপর দেখিবার শুনিবার সমুদয় ভার ন্যস্ত করিয়াছিল। যতীন রাত্রিতে আসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সেবা শুশ্রুষা করিত। শিবেনও মা, ভগ্নী এবং স্ত্রী ত্যাগ করিয়া রাধারাণীর অসুখের জন্য তাহারই বাটীতে থাকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত, হাত পা কামড়াইলে টিপিয়া দিত, ঔষধ খাওয়াইত, এই-রূপ সেবা শুশ্রুষায় নিযুক্ত হইল। পূর্ব্বেই রাধারাণী শিবেনের নিকট গান শিখিবার জন্য উহাকে যত্ন করিত ও ভালবাসিত। এক্ষণে (ব্যায়ারাম অবস্থায়) এইরূপ সেবা করায় রাধারাণীর প্রাণ আরো গলিয়া গেল, রাধারাণী একটু সুস্থ হইল। শিবেনও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিল। রাণীর মন ক্রমে শিবেনের দিকে ফিরিল। যতীনের কপাল ভাঙ্গিল।

যতীন দিনের বেলা রাধারাণীর বাটী আসিত না। এই সুযোগে পরস্পরের মিশামিশি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যতীন রাধারাণীর প্রেমে এত উন্মত্ত যে অন্ধ, শিবেনকে উহার সহিত একত্রে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় শয়ন ও ভোজন করিতে দেখিয়াও ভাবিত, "শিবেন আমার প্রাণের বন্ধু," মনে কোন কুভাব আনিত না। রাধারাণীও যতীনের নিকট বলিত যে আমার সহিত শিবেনের অত্যন্ত বন্ধুত্ব। রাধারাণী ও শিবেনের ক্রমে প্রণয় বৃদ্ধি দেখিয়া একদিন উহার মা যতীনকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি শিবেনের এখানে আসা যাওয়া বন্ধ কর, কারণ আমি উহাদিগের গতিক ভাল দেখ্‌ছি না" যতীন রাগিয়া উঠিল এবং বলিল "শিবেন আমার সেরূপ বন্ধু নহে। উহাকে গুরুতর সম্পর্ক বলিয়া ডাকে এবং শিবেনও উহার সহিত একটা গুরুতর সম্পর্ক পাতাইয়াছে। রাধারাণীকে আমি সেজন্য কখনই অবিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন রাণীর মাতা বলিল, "আমি উহার মা হইয়া যখন বলিতেছি, বিশ্বাস করিতেছ না। কিন্তু বাছা, পরে তোমার গুরুদেব তোমাকে চক্ষু ফুটাইয়া দিবেন।"

যতীন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া মানিত, রাণীকেও ঐ পথাবলম্বী করিয়াছিল। রাধারাণী প্রত্যহ পরমহংসদেবের চরণে তুলসী পত্র না দিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাধারাণীর এইরূপ গুরুদেবের উপর ভক্তি দেখিয়া যতীনের মনে সন্দেহ না থাকিবার একটী প্রধান

কারণ ছিল। রাধারাণী গুরুদেবের জন্মোৎসবের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া চাঁদা দিত। ক্রমে যতীনের উপর রাধারাণীর মন কাটিল—সেরূপ আর যত্ন করে না, কেবল সুযোগ খুঁজিতে লাগিল কিরূপে তাহাকে তাড়াই, চক্ষুলজ্জার জন্য তাহাকে মুখে কিছু বলিতে পারিত না, হাতে না মারিয়া ভাতে মারিল, অর্থাৎ যত্নে সকলেই বশ—অযত্নের কেহ নহে। রাধারাণীর যত্ন অযত্নে পরিণত হইল। যতীনের মনে মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসিযা পড়ে, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না; একদিন হঠাৎ তাহার অত্যন্ত জ্বর আসায়, রাণীর বাটীতে শুইয়া আছে এমন সময় সেই রাত্রিতে শিবেন মাতাল হইয়া তাহাদের গৃহে উপস্থিত। রাধারাণী যতীনকে ত্যাগ করিয়া শিবেনকে লইয়া ব্যস্ত হইল। যতীন অসুখে কাতর হইয়া রাণীকে বার বার ডাকিতে লাগিল—রাণী কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া শিবেনের হাতে পায়ে জল দিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বাতাস করিতে লাগিল। তখন যতীন রাণীকে কাতরে বলিল "একবার আমার দিকে ফিরিয়া দেখ, প্রাণ আমার অস্থির হইতেছে, হাত পা জ্বলিতেছে, জ্বর বেশী হইয়াছে, একবার আমার নিকট আইস, আবার তুমি শিবেনের নিকট যাইয়া যত্ন করিও।" রাণী কর্ণপাতও করিল না। আবার যতীন বলিল "রাণি! একবার আমাকে দেখ, আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি ত কখন এরূপ ছিলে না, একবার মনে ক'রে দেখ দেখি যে পূর্ব্বে আমার জ্বর হ'লে, তুমি

কেঁদে মাটী ভিজাইয়া ফেলতে, আজ আমার এই অসুখ তুমি একবারও আমার নিকট আসছ না। তোমার সে ভালবাসা কি একেবারে ভুলিয়া গেলে?" তখন রাধারাণী যতীনের উপর রাগ করিয়া বলিল—

"নিত্য রুগী দেখে কে,
নিত্য নেই দেয় কে?"

তুমি ত হাঁসপাতাল ক'রে তুলেছ, আর আমি কষ্ট ক'রতে পারি না, আমি নিজের রোগে সারা হ'চ্ছি—আবার তোমার রোগ, আর এ প্রাণে কত সয়?"

যতীন কাঁদিতে লাগিল, ক্রমে চক্ষু ফুটিল। রাধারাণীকে বলিল "আমার শরীর আরাম হইলে আমি আর তোমাকে কষ্ট দিব না। যাও তোমার প্রাণের শিবেন পড়িয়া আছে, উহাকে যাইয়া দেখ, আর তোমাকে ডাকিব না। আমি ভাল হইয়াছি, আর বিলম্ব করিও না, তুমি তোমার শিবেনের নিকট যাও—তোমার শিবেনের কাছে যাও— আবার বলি, রাণি! আজ আমি তোমার পর হইয়াছি, জ্বালা তোমার সহ্য হয় না। হায়! আজ আমার সেদিন গিয়াছে,—যেদিন আমাকে ভিন্ন জানিতে না, আমার অসুখে ধরা শূন্য দেখিতে, আমার বিহনে সংসার আঁধার দেখিতে, আমার আসিতে ক্ষণবিলম্ব হইলে কত কি ভাবিতে। দিন গিয়াছে, আমি না খাইলে তুমি খাইতে না, বসিতে না, শুইতে না, কিছুই তোমার ভাল লাগিত না। দিন গিয়াছে, যতীন ভিন্ন ইহ জগতে আর কিছুই জানিতে না, যতীনই

তোমার প্রাণের একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল। আজ যতীনের দিন ফিরিয়া গিয়াছে, আজ শিবেনের দিন আসিয়াছে, যাও তোমার শিবেনের কাছে যাও,—আর কেন আমার নিকট বসিয়া আছ,—যাও তোমার শিবেনের কাছে যাও—যাও তোমার শিবেনের কাছে যাও। ক্রমে আমার চক্ষু ফুটিতেছে। যাহা আমার শেষ বলিবার বলিয়াছি—আর কখনও ডাকিব না।" রাধারাণী অপ্রতিভ হইয়া যতীনের নিকট আসিয়া সেবা করিতে লাগিল। সেবা-কালে তাহার চক্ষে জল আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, আমার সকলেই অবুঝ, যার জন্য আমি এত করি সেও আজ অবুঝ হ'ল।" যতীন কিছু শান্ত হইল। রাধারাণী আবার বলিল, "দেখ যতীন! তুমি যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাস, যাহাকে আপনি নিজে না খাইয়া খাওয়াও, না পরিয়া পরাও, তোমার অসুখ না দেখিয়া তাহাকে দেখিয়াছি—এ কার্য্য কি মন্দ হইয়াছে? যতীন একবার ভাবিয়া দেখ, যদিও কলিকাল বটে, শিবেন আমার অসুখের সময় যথেষ্ট করিয়াছিল, আজ যদি আমি উহাকে না দেখি, তোমারও এরূপ অবস্থা যে দেখিবার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে এ কার্য্য কি ভাল দেখায়? ভাই যতীন! তোমার বিবেচনা তোমাতে থাকুক, আমি সামান্য বেশ্যা, আমরা কৃতজ্ঞ, কখন অকৃতজ্ঞতা জানি না। আজ শিবেন মাতাল বলিয়া যত্ন করিতেছি তাই তোমার মনে অভিমান ও সন্দেহ হইল? তোমার এত হীন প্রাণ! ধিক

তোমার ভালবাসায় ধিক! যে শিবেন আমার অসুখের সময় এত কষ্ট করিয়াছে, তাহার তুলনায় মাথায় জল দেওয়া কি এত বেশী হইল? উহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি উহাকে বাপ বলিতে পারি; তোমার প্রাণের বন্ধু বলিয়া এত যত্ন করি, কিন্তু যতীন আজ আমারও শেষ, আমি আর কখন তোমার বন্ধু বান্ধবকে যত্ন করিব না।"

তখন যতীনের মনে হইল যে রাণী যথার্থই বলিতেছে; ভাবিল, আমি কি ভুল বুঝিয়াছি, আমার যে রাণী সেই রাণীই আছে। তখন আর হৃদিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"রাণি! আমায় ক্ষমা কর—আমি না বুঝিয়া তোমায় অনেক বলিয়াছি। তুমি শিবেনের কাছে যাও, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তুমি শিবেনকে দেখ, আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি তুমি শিবেনের কাছে যাও, আর আমার মনে কোন দ্বিধা নাই।" "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া"—রাণীরও সুযোগ জুটিল, শিবেনের কাছে চলিয়া গেল। যতীন তখন ভাবিতে লাগিল, "আজ আমার কি দিন গেল। রাণীর মার নিকট হইতে কোন কথা শুনিয়া আজ আমি কি করিতে বসিয়াছিলাম। এমন সাধের ভালবাসার মূলে এখনই কুঠারাঘাত করিয়াছিলাম। আজ রাণী আমাকে ঐরূপ না বুঝাইলে আমি আমার প্রাণের রাণীকে হারাইতাম। লোকে এরূপ স্থলে পরের কথায় বিশ্বাস করিলে তাহার পরিণামে বিষময় ফল ফলে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"বঙ্গেশ্বর পতন" ও "নচ্ছার বাজারে" রাধারাণীর নৃত্য গীত শুনিয়া, দেবেন্দ্রের মন রাণীর দিকে টলিল—আর বাধা মানিল না। দেবেন্দ্র একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, নিশিদিন ঐ চিন্তাই অন্তরে জাগিতে লাগিল—রাধারাণীকে কি উপায়ে বক্ষে ধরিবে এই চিন্তায় আকুল হইল। অকূলের কাণ্ডারী টেঁপা। অগত্যা তাহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। ইতি-পূর্ব্বে হারার সহিত দেবেন্দ্রের শুভসম্মিলন কালে টেঁপা বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু দেবেন্দ্র হারাকে লইয়া তাহার সেই গুণপণা ভুলিল। সুতরাং টেঁপার আদর গেল। নবান্নের পর কাকের আদর কোথায়? টেঁপা বিষাদিত মনে দিন কাটাইতে লাগিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত শীকার পাইয়া লাফাইয়া উঠিল।

গোঁফ চুমরাইয়া দেবেন্দ্রকে আশ্বাস দিল, "বাজী মাৎ—আমি এক ইঙ্গিতে কাম ফরসা করিব।" দেবেন্দ্র কহিল, "আমার প্রাণ তোমার হাতে, তুমিই আমার এ জগতের গতি—আমার যথার্থ বন্ধু—বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী।" টেঁপা দশটী টাকা চাহিল। দেবেন্দ্র অব্যক্তে তাহাই দিল। টেঁপা টাকা টেঁকে গুঁজিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে, গাড়ী লইয়া রাণীর বাটীতে একেবারে উপস্থিত। দৈব সহায় বশতঃ তথায় শিবেন ছিল না। অবসর বুঝিয়া রাণীকে হারার নজীর দেখাইয়া দেবেন্দ্রের অবস্থা সমুদয় বলিতে লাগিল।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই নজীরের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সেই গৌরচন্দ্রিকা—টেঁপার সেই ভণিতার আরম্ভ এইরূপ—"দেবেন্দ্র বাবু একজন বড় লোক, বয়স কাঁচা, দেখিতে অতি সুন্দর—সুপুরুষ। তোমার এ নব যৌবন কেন একটা বুড়োর হাতে লুটাইতেছ? দেবেন্দ্র বাবুকে ভজিলে দেখিবে, তুমি একেবারে রাজরাণী হবে" ইত্যাদি। এইরূপ শোনা কথা কহিয়া পরিশেষে বলিল "দেবেন্দ্র বাবু এক ছড়া ব্রিজ হার হারাকে প্রথম মিলনের উপহার দেন। হারার পূর্ব্ব প্রেমিক সুধারামের আমলে তাহার ঘরের কোনরূপ ভাল আসবাব ছিল না। থাকিবার মধ্যে কেবল মাত্র একটী বড় আলমারি, দুইটা দেওয়ালগিরি, একটি পাথরের টেবিল, এক খানি পালংপোষ ও দুই একখানি ছবি। এখন দেবেন্দ্র বাবু উহার ঘরটি ছবি

করিয়া তুলিয়াছেন, ভাল ভাল জিনিষ পত্রে সাজাইয়া দিয়াছেন। দেখ দিদি! তুমিই বা কেন এ দাঁও ছাড়িবে? তোমারও কপাল ফিরিবে। আমারও দু পয়সা হবে—যেন সময় পাইয়া আমার উপর নিদয়া হইও না—অধীনের এই ভিক্ষা।"

রাধারাণী সুযোগ পাইয়া পেঁচ কসিতে লাগিল। টেঁপাকে বলিল, "দেখ ভাই! দেবেন্দ্র হারার প্রেমে উন্মত্ত—এখন আমি যতীনকে ছাড়িয়া কিরূপে যাই? দেবেন্দ্র অব্যবস্থিত চিত্তের লোক, তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব? হারার সহিত আমার আলাপ রহিয়াছে, এ কার্য্য আমি কি প্রকারে করিব? তবে "পেটে খেলে পিটে সয়" তেমন দিতে পারে, তা হ'লে আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হ'তে পারি।" টেঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?" রাণী বলিল, "আমি যাহা চাই তাহা কি একেবারে দিতে পার্ব্বে? আমি চেন হার, আংটি চাই।" টেঁপা বলিল "বিশ্বাসের উপর কার্য্য ক'রে কি ফল হয় দেখ্‌বে। আমাদের কার্য্য ডান হাত বাঁ হাত, আমি আজই দুপুর বেলা তোমার ঐ সকল জিনিস আনিয়া দিব।" রাধারাণী বলিল "অদ্য কি প্রকারে যাইব? যতীনের অসুখ, কি প্রকারে উহাকে ফেলিয়া যাইব?" টেঁপা থিয়েটারের অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র ছিল, বলিল "আমি নিজে ছুটি করিয়া অন্য বাগানে লইয়া যাইব। রিহার্সেলে যেরূপ সময়ে যাও সেই সময়ে যাইবে এবং বাগান হইতে ঠিক রিহার্সেল শেষ হইবার সময় বাড়ী

আসিবে, যতীন ইহার কিছুই জানিতে পারিবে না।”

টেঁপা বলিল—

“গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকবে,
পিতৃলোক উদ্ধার হবে।”

সেই দিনই দুপুর বেলা টেঁপা আসিয়া চেন-হার ও একটী আংটি দিয়া সমুদয় ঠিক করিয়া চলিয়া গেল। রাধারাণী সে দিবস যতীনকে বেশী যত্ন করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা গেল, রিহার্সেলের গাড়ী আসিল। রাধারাণী গাড়ী ফিরাইয়া দিল, বলিল “আপ্সে যাগা।”

রাধারাণী উত্তম করিয়া সাবান মাখিয়া গাত্র পরিষ্কার করিয়া—গায়ে হেনার আতর মাখিল, উত্তম বেশ-ভূষা করিল, দু একখানি গহনা যাহা ছিল পরিল। যতীন জ্বর অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া সমুদয় দেখিল এবং রাধা-রাণীকে বলিল “আজ এত সাজ-সজ্জা কেন? কোন দিন ত তুমি থিয়েটারে এরূপ সাজিয়া যাও না। আজ ভাঙ্গা মন্দিরে চূণকাম কেন? কোন নূতন গোপাল রাসে উঠ্‌বেন নাকি?” রাধারাণী বলিল “তুমি অত ঠাট্টা ক’রছ কেন? তুমি যদি বল, এখনি আমি সমুদয় খুলে ফেল্‌’ব; তবে দুখানা যাহা আছে একদিন প’র্‌লে কিছু কি ক্ষতি আছে? মনে সাধ হ’য়েছে তাই প’র্‌ছি। আর গহনা কাপড় ত তুলে রাখবার জিনিষ নয়।” যতীন একটু লজ্জিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কখন আস্‌বে?” “আজ একটু দেরী হবে কিন্তু যত শীঘ্র পারি আস্‌তে

চেষ্টা ক'র্‌ব, কারণ তোমার অসুখ দেখে যাচ্ছি—আর যদি নূতন পুস্তকের রিহার্সেল না হ'ত তা হ'লে তোমাকে এরূপ অবস্থায় ফেলে কখনই যাইতাম না। আমি এখনি চ'লে আস্‌ব, একবার হাসি মুখে বল "তুমি এস।" যতীন বলিল "আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি আজ বাটীর বাহির হও, কিন্তু কি ক'র্ব্ব, নূতন পুস্তক বলিয়া কথা কহিতে পারিলাম না, যত শীঘ্র পার চ'লে এস।" রাধারাণী চলিয়া গেল।

টেঁপা একখানি গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, দুই ভগ্নীতে গাড়ীতে উঠিল, থিয়েটারে ছোট ভগ্নীকে নামাইয়া দিল—বাদুড় বাগানের দিকে চলিল। দেবেন্দ্র বাবু নিজের বাগানে কখনই যাইতে পারিবেন না, কারণ সেখানে স্ত্রী বিরাজমানা, সেজন্য কোন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বাগানে যাইবার স্থির করিল। ঐ বন্ধুর বাগান সোদপুর। রাধারাণী আসিয়া দেখিল, দেবেন্দ্র হরিবাবুর বাটীতে বসিয়া আছে; যাইবামাত্র দুজনে গাড়ীতে উঠিয়া আসিল, রাধারাণীর পাশে দেবেন্দ্র এবং টেঁপার পাশে হরি বাবু বসিল। তখন টেঁপা আস্ফালন করিয়া বলিল "দেখ দেবেন্দ্র বাবু, আমার যে কথা সেই কাজ।" দেবেন্দ্র বাবু টেঁপাকে বলিল "তবে তোকে এত যত্ন করি কেন। তুই জয়কেতু, তুই দুদিক গা'স্‌, তোর এই সকল গুণে আমি কেনা আছি।" এইরূপে নানা রঙ্গরস করিতে করিতে সোদপুরের দিকে গাড়ী গড় গড় করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে বেলঘরিয়া পার হইয়া,

সোদপুরের বাগানে পৌছিল। তখন রাত্রি প্রায় ৭টা। বাগানটী দেখিলেই বিশেষ বড় লোকের বলিয়া বোধ হয়। রাধারাণী এবং আর আর সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া একটী হলে যাইয়া উপস্থিত। টেঁপা বাগানে আসিবার পূর্ব্বেই এক বোতল উত্তম পোর্ট এবং নিজে খাইবার জন্য ধান্যেশ্বরী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। টেঁপা সকলকে গ্লাস ভরিয়া দিতে লাগিল, ক্রমে জমাট স্ফূর্ত্তি চলিতে লাগিল। টেঁপা থিয়েটারের গান ধরিয়া, নাচিতে লাগিল। কিন্তু রাধারাণীর প্রাণে যতীনের ভয় আসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র তাহাকে গান গাইতে অনুনয় করিল। অগত্যা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভয়কম্পিত স্বরে গান ধরিল।

"ময়া দুখা পুছাতো হামারি" এই গানটী গাহিল। দেবেন্দ্র ও হরি বাবু গান শুনিয়া বিমোহিত। ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ায় রাধারাণীর প্রাণ তখন বাড়ী আসিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। টেঁপাকে চুপি চুপি বলিল "আর দেরী ক'রনা আমাকে ঠিক্ সময়ে পৌছিতে হ'বে,' আর কেন, চল।" টেঁপা বলিল "তুমি কিছু ভাবিও না, তোমার যদি যতীন যায়, তা হ'লে এক যতীন যাবে অন্য যতীন হ'বে, তোমার সিংহাসন কভু খালি নাহি রবে।" ইহার পর দেবেন্দ্র রাধারাণীকে গৃহান্তরে লইয়া গেল। তথায় তাহাকে বক্ষে ধারণ ও মুখচুম্বনাদি করিয়া অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিল। রাধারাণী সুরে ধরিল।

"পরেরই পরাণ তুমি কেন এলে এখানে"

দেবেন্দ্র ভাবিল, রাধারাণী অবশ্য রসিকা, যেমন চায় ঠিক্ সেইরূপ পাইয়াছে। দেবেন্দ্র বলিল "তুমি আমার প্রাণ জাননা, তোমারই প্রতিমূর্ত্তি আমার অন্তরে নিয়ত জাগিতেছে, দেখাইবার নয়,—নইলে দেখাইতাম। তোমাভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা।" রাধারাণী বলিল—

"পুরুষ ভ্রমর-জাতি নানা ফুলের মধু খাও,
যখন যার কাছে থা'ক তখনি তার মন যোগাও।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিল, "তুমি কেতকী "আজ আট্‌কা প'ড়েছে, অলি কেতকী ফুলে।" অনন্তর পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন সমাপন করিয়া অধরদংশনচিহ্ন প্রেমের নিশানা করিয়া দিল। ক্রমে সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; গাড়ী কলিকাতাভিমুখে চলিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে কাঁচা রাস্তা দিয়া আসিতে গাড়ীখানির চাকা কাদায় বসিয়া গেল। অনেক কষ্টে চাকা উঠিলে পুনরায় গাড়ী চলিল। কলিকাতায় নিরূপিত সময়ে আসিতে পারিল না, অনেক রাত্রি হইল। "পাপ-কার্য্য কখনই ছাপা থাকে না।" "ভাঙ্গা জানালা ভগবান দেখিয়ে দেন"—কোথায় রাধারাণী নিরূপিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিবে, তাহা না হইয়া সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে যতীন রোগে ছটফট্ করিতেছে, কখন চাকর বাতাস করিতেছে, এক একবার উঠিয়া বসিতেছে, কখন জল খাইতেছে, এক একবার ঘড়ির দিকে দেখিতেছে, কখন তামাকু খাইতেছে, এইরূপ অবস্থায় ১১টা বাজিল। তখন ভাবিতে লাগিল, রাণী কেন এখনও আসিতেছে না? একবার উঠিয়া রাণীর খবর লই, যদি পথে দেখা হয় তাহা হইলে ফিরিয়া আসিব। এমন সময় রাধারাণীর ছোট ভগ্নী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। তৃষিত চাতক যেরূপ বারিপানে তৃপ্ত হয়, যতীন রাধারাণীর ভগ্নীকে দেখিয়া মনে ভাবিল যে আমার রাধারাণী আসিয়াছে; আমার যন্ত্রণা এতক্ষণে শেষ হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদি কোথায়?" ভগ্নী উত্তর করিল "এখন তাহার আসিতে বিলম্ব আছে, শিশির বাবু উহাকে নূতন পার্ট শিখাইতেছেন।" ইতিপূর্ব্বে যতীন কষ্টাতিশয্য-হেতু রাধারাণীকে বাটী আনিবার জন্য থিয়েটারে দুই তিনবার বেহারা পাঠাইয়া ছিল। চাকর আসিয়া বলিল,"ভিতরে যাইতে পারিলাম

না; এখনও নাচ গান হইতেছে, শেষ হয় নাই।" সুতরাং যতীন স্বয়ংই ঐরূপ অবস্থায় উপর হইতে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে থিয়েটারে গেল। থিয়েটারে যাইয়া দরওয়ানকে দু'চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিল। দরওয়ান ঐ স্থানে অনেক দিন কর্ম্ম করিতেছে এবং যতীনকে অত্যন্ত মান্য করিত। সে ছুটিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনার এরূপ অবস্থা কেন দেখিতেছি? আপনার শরীর শীর্ণ ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে কেন?" যতীন থিয়েটার হইতে একটী সোডা ও পান খাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও কি রিহার্সেল শেষ হয় নাই?" দরওয়ান বলিল "অনেকক্ষণ রিহার্সেল শেষ হইয়া গিয়াছে, থিয়েটারে কেহই নাই সকলেই চলিয়া গিয়াছে।" যতীন দেখিল সমস্যা বুঝা দুষ্কর, জিজ্ঞাসা করিল "রাণী বিবি আজ থিয়েটারে আসিয়াছিল কিনা?" দরওয়ান বলিল "বিবি থিয়েটারে আজ একেবারে আসে নাই।" টেঁপা ও দেবেন্দ্র বাবুর সহিত একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতে আমি দেখিয়াছি। আমি যখন থিয়েটারের প্লেকার্ড মারা ঠিক্ হইয়াছে কিনা তদারক করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, তখন প্রায় সন্ধ্যা। যতীনের মাথা ঘুরিয়া গেল, এই সংবাদে যেন বিনা মেঘে বজ্রাহত-তরুর ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এক পাও চলিতে পারিল না, অতিকষ্টে রাস্তার ধারের বাটীর দেয়াল ধরিয়া রাধারাণীর গৃহে আসিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। রাত্রি ২টা বাজিল। রাধারাণী

বাগান হইতে থিয়েটারে আসিয়া দেখে যে, ভগ্নী নাই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। পরে আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী না আসিয়া শিবেনের বাটীতে যাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিল। যতীন স্থির হইয়া ভাবিতেছে, একবার মনে হইতেছে, "আমার রাণী শেষে আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া কি প্রকারে বাগানে আমোদ করিতে গেল? প্রাণের বন্ধু দেবেন্দ্রবাবু এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। অতি বড় শত্রু যে তাহার আশ্রয়ে পড়িলে, সেও এ অবস্থায় কখনই ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পারে না। কি পৈশাচিক আচরণ! যতীন জীবন আহুতি দিয়া দেবীমূর্ত্তি বলিয়া রাধারাণীকে এতদিন হৃদয়ে বরাবর পূজা করিয়াছিল, সে পূজা এক্ষণে ব্যর্থ হইল। যতীন এখন বুঝিল সে দেবী পূজা পিশাচীর পূজাতেই নষ্ট হইয়াছে। ভাবিতে লাগিল, কোন কার্য্যে ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া একেবারে প্রবৃত্ত হওয়া কি অন্যায়? এমন সময় রাণী ও শিবেন উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। শিবেনকে রাণীর সহিত একত্রে দেখিয়া যতীনের প্রাণ আরো জ্বলিতে লাগিল। যতীন ভাবিল, "দেবেন্দ্রবাবু আমার প্রাণের বন্ধু, তিনি যে এরূপ কার্য্য করিবেন, ইহা অসম্ভব; জগদীশ্বর ইহার বিহিত করিবেন। শেষে একবার রাণীকে দেখিয়া দুই একটী কথা বলিয়া জন্মের মতন বিদায় লইয়া যাইব। যতীন রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাত্রি অবধি কোথায় ছিলে?" রাণী বলল,

"আমি আমাদিগের থিয়েটারের কৃষ্ণবাবু, তাঁহার বাইজী ও শিবেনবাবুর সহিত একটু মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।" যতীন বলিল "আচ্ছা তাহাই মানিলাম, আমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া তোমার কি প্রকারে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা হইল? একটু মনে হইল না যে, একটা লোক ব্যায়ারামী অবস্থায় আমার আশ্রয়ে রহিয়াছে; উহাকে ফেলিয়া কি প্রকারে যাই। ইহা কি মনোমধ্যে একবারও ভাব নাই?" রাণী বলিল, "যাহার মাহিনা খাই তাহার একটা কথা রাখিতেই হইবে, সেজন্য চলিয়া গিয়াছিলাম।"

যতীন বলিল "তোমার মার কথা এক্ষণে আমার ঠিক্ বিশ্বাস হইতেছে। তাহার রকম আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধিতেছে, তুমি দেবেন্দ্র বাবুর বাগানে গিয়াছিলে? এবং শিবেনের সহিত তোমার ত বন্ধুত্ব ভাব নহে, তোমার কথায় এবং ব্যবহারে এক্ষণে ঠিক্ জানিলাম যে তুমি শিবেনকে প্রাণে প্রাণে ভালবাস, তাহা না হইলে তুমি কখনই আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে না।" যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি টেঁপা এবং দেবেন্দ্রবাবুর সহিত বাগানে যাও নাই? আমি সব জানিতে পারিয়াছি। আর কেন লুকাইতেছ, খুলিয়া বল!" রাধারাণী বলিল 'যদি বিশ্বাস কর—আমি যাই নাই, আর যদি না বিশ্বাস কর, তাহা হইলে গিয়াছিলাম, বেশ করিয়াছি। আমরা বহুরূপী, যখন যে ভাব আবশ্যক হয়, তাহা আমাদিগের আয়ত্বাধীন।" যতীন বলিল, "আমি এক্ষণে জানিলাম,

তুমি আমার সহিত এতদিন কপট প্রণয় করিয়াছিলে। এই কি তোমার যথার্থ ভালবাসা? তোমার প্রাণ এত নীচ যে, আমার প্রাণের বন্ধু শিবেন—যাহাকে আমি পায়ে ধরিয়া তোমার উন্নতির জন্য আনিয়াছিলাম—আপনার মুখের খাবার না খাইয়া খাওয়াইয়াছিলাম, সেই বন্ধুকে তুমি অনায়াসে প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌লে?" রাধারাণী বলিল "যতীন তুমি কি এতদিনেও বুঝ নাই যে, আমরা স্বার্থের জন্য সকলই করি, বেশ্যা তীব্রবিষধরী ভুজঙ্গিনী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, আমরা স্বার্থের জন্য সকলই পারি! আমরা স্বার্থ—সিদ্ধির জন্য হাসি মুখে বিষ খাওয়াইতে পারি, বুকে ছুরি মারিতে পারি! পৃথিবীতে যত কল্পনাতীত মন্দ কার্য্য আছে, তাহা কেবল আমাদিগেরদ্বারা সম্পাদিত হওয়াই সম্ভবপর। আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পদ-দলিত করিতে সময় অপেক্ষা করি না। আমাদিগের হৃদয় কোমলতা-শূন্য—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।

যতীন বলিল "রাণি! পূর্ব্বের ঘটনাগুলি একবার মনে কর দেখি; আমাকে কতই পত্র লিখিযাছিলে এবং কালী-ঘাটে কালীর মন্দিরের ভিতর ফুল হাতে করিয়া না দিব্য করিয়াছিলে—আমি তোমাকে কখনই ছাড়িব না; তুমি না ছাড়িলে, আমি কখনই ছাড়িব না।" রাধারাণী উত্তর করিল, "সকলই স্বার্থের জন্য করিয়াছিলাম; বেশ্যাদিগের কি অকপট ভালবাসা আছে? ইহা তুমি কি এতদিন জানিতে পার নাই? যাহা যাহা বলিয়াছি এবং করিয়াছি,

সকলই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য।" যতীন বলিল, "রাণি! তুমি যে আমার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলে, এবং পুরুষ-বেশে আমার বাটীর বৈঠকখানায় যাইয়া আমার পদপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিতে, এখন সে সকল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।" রাধারাণী বলিল, "সকলই স্বার্থের জন্য করিয়াছি।" যতীন বলিল, "আমি তোমার জন্য কত অপমান সহ্য করিয়াছি—বাটীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি, এ সকল কি তোমার মনে একবারও উদয় হয় না? একবারও কি ভাব না যে, এই লোকটা তোমারই জন্য ধনে প্রাণে মারা গেল। আপনার গৃহলক্ষ্মীর মৃত্যু-শোক তোমাকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম এবং তুমিই না পত্রে লিখিয়াছিলে—আমাকে কি করিতে বল, আমি তোমার সহধর্ম্মিণীর অনুগামিনী হইয়া পদ সেবা করিতে বলিলে, তাহাতেও সম্মতা। তোমরা যদি এমন অব্যবস্থিত-প্রকৃতির লোক, তবে কেন আমাকে পূর্ব্বে মজাইয়াছিলে?" রাণী বলিল, "তোমাতে আমাতে খাদ্য-খাদকতা সম্পর্ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কালসর্প বক্ষে ধারণ করা কিংবা ব্যাঘ্রকে লইয়া ক্রীড়া করা সহজ, কিন্তু বেশ্যার সহিত একত্র সহবাস করা শত সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর। যতীন! সংসার শিক্ষার স্থল, শুধু তোমাকে শিক্ষা দেওয়া নহে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের শিক্ষা হইবে।" অনুতাপরূপী সহস্র সহস্র বৃশ্চিক যতীনকে দংশন করিতে লাগিল; যতীন জ্বালায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল। এ জ্বালার কিসে নিবারণ

করিবে? বিস্মৃতিরূপ অমৃতবারি পান ভিন্ন এ রোগের শান্তি কিছুতেই নাই।

যতীন শিবেনকে বলিল "ভাই শিবেন! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমাকে এরূপ সম্বোধন করিতে আত্মগ্লানি হয়।" শিবেন বলিল, "ভাই যতীন! তুমি সকলই ভুল বুঝিয়াছ।" যতীন বলিল, "আমি এতদিন উহার প্রেমে এবং বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া সকলই ভুল বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার গুরুদেব আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। আর লুকাইওনা; যে যেরূপ আবরণে আবরিত হউক না কেন, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি এক সময়ে না এক সময়ে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। রাধারাণী আমাকে এতদিন কুহক-জালে আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সে কুহক টুটিয়াছে; এক্ষণে প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি—রাধারাণী পিশাচিনী। তোমাকে আর কি বলিব? তুমি প্রাণের বন্ধু হইয়া, আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলে। তুমিই না বলিয়াছিলে যে, এরূপ বন্ধুত্বস্থলে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলে তাহার নরকেও স্থান নাই! ভাই শিবেন! এখন সে কথা অতল জলে ফেলিয়া দিয়া, আমার প্রাণে শেল মারিয়া আমার প্রাণের প্রাণ রাধারাণীকে যে, কাড়িয়া লইলে, ইহা আজন্মকাল মনে থাকিবে। এ সংসারে বেশ্যা বলিয়া কোন নূতন জীব নাই; এই সংসার হইতেই বেশ্যার উৎপত্তি। এ সংসার যখন এতদূর জঘন্য পদার্থে পরিপূর্ণ, তখন ইহার ত্যাগই শ্রেয়ঃ। শান্তি কোথাও নাই। এখন যাও রাণি!

তুমি শিবেনের পাশে দাঁড়াও। গুরুদেব এতদিনে বিশেষরূপ চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। "হায়! আমার সাধের আশালতা এতদিনে ছিন্ন হইল।"

এই বলিতে বলিতে যতীন মনের কষ্টে ঈশ্বরের পদ-ধ্যান-মানসে সেই রাত্রেই রাধারাণীর গৃহ জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। যতীন বেশ্যার কপট প্রেমে পড়িয়া দেশ-ত্যাগী হইল। কোথায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহা না করিয়া সোনার সংসার একে-বারে ছারেখারে দিল! বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের প্রাণে শেলাঘাত করিয়া গেল। একা যতীন ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল নহে, এরূপ কত শত যতীন বেশ্যার কপট প্রণয়ে পড়িয়া—কত সোনার সংসার ছারখার করিতেছে, তাহার কে নির্ণয় করে?

যতীন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শিবেন ও রাধারাণী উভয়ে নির্ভয়ে একত্র সহবাস করিতে লাগিল। রাধারাণী উহার খরচ পত্র সমুদয়ই দিত, নিজে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিল; একবারও ভাবিল না যে, যতীন কত ভাল বাসিত কত যত্ন করিত! এক্ষণে শিবেনের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমুদয় ভুলিয়া গেল—বোধ হইল, যেন একটা কণ্টক দূর হইয়াছে। রাধারাণী আর কাহারও নিকট "নিজস্ব" রহিল না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে যে তাহা হইলে শিবেনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইবে। কোন ভদ্র সন্তান ঐরূপ ব্যবহার দেখিলে উহার নিকট আসিবে না। যতীন উহাকে থিয়েটারে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া রাধারাণীর প্রাণে আর অন্য উপায়ের চেষ্টা ছিল না, ঐ মাহিনা হইতেই অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। মনে সেরূপ স্ফূর্ত্তি রহিল না। রাধারাণীর দেহ শীর্ণ, মলিন, সে তেজ আর নাই। খরচ পত্র সমুদায় কমাইয়া দিল, এমন কি বাটীর চাকরটী রাখিবারও ক্ষমতা রহিল না। শিবেনও ভদ্র সন্তান হইয়া ঐরূপ জঘন্য কার্য্যে

নিযুক্ত রহিল ও সকল গৃহ কার্য্য করিতে লাগিল। রাধারাণী মার বশীভূত নহে, তাহা হইলে উহার পরে ভাল হইত। উহার মাতাকে দেখিলে বোধ হয় মিষ্টভাষিণী এবং সরলান্তকরণা; কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে একটা মিছরির ছুরী বলিয়া জ্ঞান হয়। যতীন রাধারাণীর প্রণয়ে অন্ধ হইয়া এত দিন কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু এক্ষণে উহার ব্যবহারে বেশ বুঝিল, যে, সেই রাধারাণী বিশ্বাসঘাতিনী এবং প্রাণ-হারিণী। রাধারাণী দেবেন্দ্র বাবুর ভরসায় এই কার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু শেষে দেবেন্দ্রও আর উহার খোঁজ খবর লইল না। ঐ সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর নিকটে মদন নামে একটি হরিতাল ঘুঘু (yellow dove) জুটে। মাসিক পত্রিকা খানির সুবন্দোবস্তের ভার সমুদয়ই তাহারই উপর দেওয়া হয়। উঁহার শুভাগমনেই পত্রিকা-খানিরও অকাল মৃত্যু ঘটে। দেবেন্দ্র বাবুও সেই পর্য্যন্ত কোথায় অন্তর্ধান হইলেন, কেহ আর সন্ধান পাইল না। এদিকে শিবেনের হাঁতে পড়িয়া রাধারাণীর দুর্দ্দশার এবং অপমানের আর কিছুই বাকী রহিল না।

টেঁপা দেবেন্দ্রবাবুর একটী বহুমূল্য আংটী সরাইয়া-ছিল, ধরা পড়ায় পুলিশের হাতে দেওয়া হয়; বিচারে ছয়মাস শ্রীঘরবাসের আজ্ঞা হয়। কাজেই টেঁপার সহিত দেবেন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটিল। "পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনার মন্দ আগে হয়।"